যাদের বিয়ে হ'ল



শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

ছবিগুলি লেখকেরই আঁকা

বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাড়ে তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫১

দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

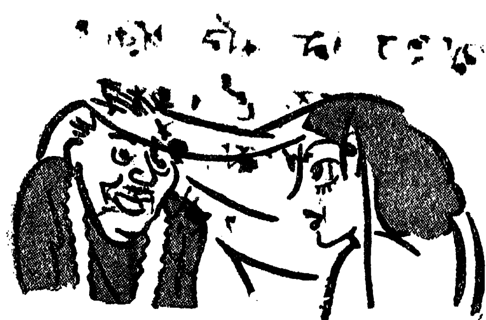


বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রিণ্টার—শ্রীকালীশঙ্কর বাক্‌চি এম্-এস্-সি, ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস, ৩৮এ, মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও, বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।





এই বইএ যা আছে—



স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ
[illegible]কে উপহার
দিলাম, ইতি
দিদি, ১৩৫২

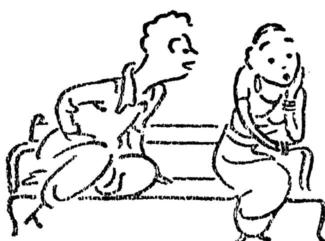
স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ
কাজলকে উপহার
দিলাম ইতি
দিদি ১৩৫২

"লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই।"

*   *   *

"অধিকাংশ বর্ব্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেই জন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।" - - - -

—রবীন্দ্রনাথ





—যাদের বিয়ে হ'ল—

বিয়ে কি ?

বড় জটিল প্রশ্ন, নয় কি ? অনেকে অবশ্য বলবে, আরে ছো, এ আবার প্রশ্ন হ'ল ? এর চেয়ে সহজ প্রশ্ন আর হ'তেই পারে না। তারা বলবে, কোল-ভীল কেষ্টা-বিন্দে থেকে আরম্ভ ক'রে আজ কালকার মিষ্টার-মিসেস দলের সবাই এর ব্যাখ্যা ক'রে দিতে পারে। মানুষ যখন অসভ্য বর্ব্বর ছিল তখন থেকে এর প্রচলন হয়েছে আর আজ পর্য্যন্ত চল্‌ছে এই প্রথা—এ আর জানে না কে ?

সূর্য্যকেও ত' আদিম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত দেখে আসছি কিন্তু আমরা ক'জনই বা সূর্য্যের সত্যকার স্বরূপ জানি?

আচ্ছা বেশ, আমরা এক বিবাহিত দম্পতিকে প্রশ্ন ক'রেই দেখি না, তাঁরা কি বলেন। তাঁদের জবাব শুনলে সাধারণের কাছে বিয়ে ব'লতে কি বোঝায়, তার খানিকটা আভাস অন্ততঃ পাওয়া যাবে। অভিধানে বিবাহের ব্যাখ্যা আছে—বিবাহ হচ্ছে বি পূঃ বহ্ ধাতু ঘঙ্ অর্থাৎ বিশেষরূপে বহন ইত্যাদি। কিন্তু এ সব ঘঙ্ টঙ্ নিয়ে ত' আমাদের চলবে না। আমরা চাচ্ছি···আচ্ছা অমলবাবু, আপনার ত' সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে? আপনি যদি দয়া ক'রে বিয়ে সম্বন্ধে আমাদের দু' একটা প্রশ্নের জবাব দেন, তা হলে আমাদের সমস্যা সমাধানের খানিকটা সুবিধা হয়। আহা-হাঃ আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—দয়া করে ঐ চেয়ারটায় বসুন না! পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া শিখেছেন আর উপযুক্ত বয়সেই বিয়ে ক'রেছেন—আশা করি আপনি লজ্জিত বোধ ক'রছেন না?······বেশ, বেশ······

—আচ্ছা বিয়ে কি?

—আমাকে দয়া ক'রে আরও সহজ কিছু জিজ্ঞাসা করুন।

—আমি জানতাম, আপনার বিয়ে হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে, দরকার মনে করলে আপনি······

—আরে ছিঃ ছিঃ আমি প্রমাণ চাচ্ছি না! তা, আপনার বিয়ে কেমন ক'রে হ'ল?

—কন্যাপক্ষের বাড়ীতে···

—তা জানি, কিভাবে হ'ল?

—পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন, শ্বশুরমশাই কন্যাসম্প্রদান করলেন, তারপর হোম, স্ত্রী-আচার ইত্যাদি হ'ল। মেয়ে-পুরুষের হৈ-হুল্লোড় আমোদ-উৎসব কত কি—

—এগুলিকেই আপনি বিয়ে বলবেন নাকি?

—না, তা নয়, তবে মন্ত্রপাঠ, উৎসব আয়োজন এগুলিকে বিয়ের বড় অঙ্গ বলেই ত' মনে হয়।

যাদের বিয়ে হ'ল

—না অমলবাবু, আপনাকে দিয়ে আমাদের বিশেষ সুরাহা হ'ল না। ধন্যবাদ! শুনেছি পুরুষের চেয়ে মেয়েদের কাছে বিয়ের গুরুত্ব বেশী এবং বিয়েই নাকি তাঁদের জীবনে সব চেয়ে বেশী দরকারী। আপনি কিছু যদি মনে না করেন, আপনার স্ত্রীকে এ বিষয়ে দু'একটা প্রশ্ন করতে পারি কি ?

—স্বচ্ছন্দে, তবে লেখা-পড়া জানা হোলেও আমার স্ত্রী যে আপনাকে বেশী কিছু বোঝাতে পারবে তা আমার মনে হয় না...

—নমস্কার, মাধুরী দেবী। বিয়ে সম্বন্ধে আপনাকে যদি দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আশা করি আপনি কোন অপরাধ নেবেন না। ...না, না—লজ্জার কোনও কারণ নেই, তা ছাড়া লজ্জাহারী ত' সামনেই রয়েছেন।

—প্রশ্ন করুন, আমি প্রস্তুত আছি।

—বিয়ে বলতে আপনি কি বোঝেন ?

—আমার বিয়ে বেশী দিন হয় নি।

—বিয়ে কি, এটা বুঝতে বেশী সময়ের দরকার হয় না কি ?

—নিশ্চয়। আমার বিয়ে মাত্র আট মাস হ'ল হয়েছে। মাত্র এই আট মাসে বিয়ের কতটুকু জানা যায় বলুন ? তা ছাড়া আমি শ্বশুরবাড়ীতে বেশী দিন বাস করিনি।

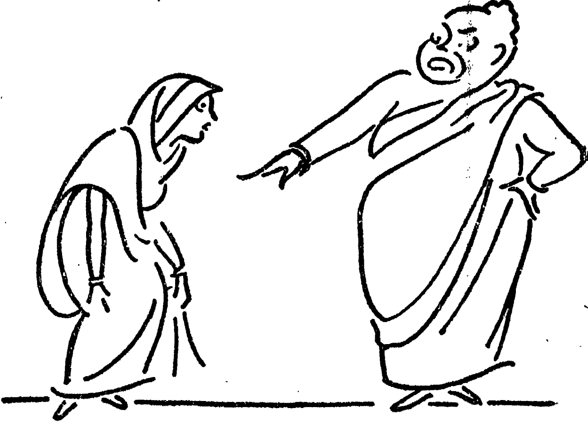
—শ্বশুরবাড়ীতে আপনার নতুন অভিজ্ঞতা কিছু হয়েছে কি ?

—তা হয়েছে অনেক। সবগুলি নতুন লোকের মাঝে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রথমে কি কষ্টই যে হয়েছিল! সবার মন জুগিয়ে চলা, ছোট বড় সকলকে সন্তুষ্ট করা কি সহজ কথা! সকলেই মনে মনে দাবী করে অনেকখানি কিন্তু প্রকাশ্যে সাহায্য করে কম লোকেই। বৌ হিসাবে কর্ত্তব্যের ফর্দ্দ বড় কম নয়।

—নববধূর কর্ত্তব্য বিষয়ে আপনার জ্ঞান কবে এবং কিভাবে হ'ল ?

—কেন, বাপের বাড়ীতেই আমরা এ বিষয়ে শিক্ষা করি। মা এবং আত্মীয়াদের কাছে শুনে ও আশেপাশে অনেক বাড়ীতে দেখেও শেখা

যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখেছি। যেমন নতুন বৌ অবাধ্য বা আত্মসর্ব্বস্ব হ'লে তার নানা নিন্দা সবার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।



দাবী করে অনেকখানি

—এতক্ষণ আপনি কিন্তু আপনার স্বামীর নাম একবারও করেন নি। যেন বিয়ের মধ্যে শ্বশুরবাড়ীর সবাই বড়, আর স্বামী সবাই-এর ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত! মাফ করবেন, হ'তে পারে আপনি লজ্জাশীলতার দিক থেকে······

—না তা নয়, তবে আপনার প্রথম অনুমানই কতকটা ঠিক। শ্বশুর বাড়ীতে স্বামীর সঙ্গে আমার প্রকাশ্য যা সম্বন্ধ সেটা আর সবাইকার মত, বরং সময়ে সময়ে তারও চেয়ে খাটো। তাই বলে আপনি যেন মনে করবেন না যে সব সময়ই আমরা ঐ রকম। দু'জনে যখন নিরালায় থাকি তখন...,

—আচ্ছা বলে যান।

—একদিনের কথাই বলি। আমার শ্বশুর খুব রাশভারি লোক—ছেলে অর্থাৎ আমার স্বামীর ওপর সর্ব্বদাই চোখ রাখেন পাছে মন হারিয়ে 'পাশের' পড়ায় 'ফেল' হ'য়ে যায়। ওর তখন বি-এ পরীক্ষা। একরাত্রে চুরি ক'রে এসে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে। দুষ্টুমি বইকি! পড়ার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে আসার কি দরকার ছিল? আমি

ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়েছি মনে ক'রে শ্বশুরমশাই আমার গলা শুনে আমার ঘরে এসে হাজির। ও তখন কি করে, তাড়াতাড়ি খাটের নীচে অন্ধকারে আশ্রয় নিল। শ্বশুর মশাই চলে গেলে তখন মহাপ্রভুকে খাটের নীচে থেকে উদ্ধার করি। দেশী কাপড়খানা নষ্টই হয়ে গিছলো।

—কর্ত্তার ওপর আপনারা তুজনেই খুব চটে গেলেন নিশ্চয় ?

—চটবার কারণ ছিল বটে কিন্তু আমরা মোটেই চটিনি। আমাদের বোকামির কথা মনে ক'রে কেবলই হাসি আসছিল। মাঝে মাঝে এরকম তুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমি যেন বেশী ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলুম।


বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি

—অমলবাবুর সঙ্গে বিয়ের আগে আপনার আলাপ ছিল কি ?

—না মোটেই না, আপনার জানা উচিত যে, আমাদের বিয়ে আমাদের বাপমা'রাই স্থির করেন।

—মাপ করবেন—আমি সেভাবে কিছু বলতে চাইনি। আজকাল আলাপের পরেও অনেক বিয়ে ত' হয় যাকে বলে 'লভ-ম্যারেজ'—পাশ্চাত্য দেশে যেমন চলে 'কোর্টশিপ' করার পর বিয়ে। আমি বলছিলাম, যার সঙ্গে আপনার কোন আলাপ ছিল না, কোন দিন হয় ত' দেখা পর্য্যন্ত হয়নি—কেউ কারুর নামও হয় ত' জানতেন না, তার সঙ্গে হঠাৎ আপনি মিলতে পারলেন কেমন করে ?

—বাঃ রে, বিয়ের পর সে ত' আমার স্বামী হ'ল।

—তা হোক, স্বামী কথাটা ত' একটা নাম মাত্র। স্বামী নাম দিয়ে ডাকতে পারেন—কিন্তু তাই বলে তাকেই আপনার মন মেনে নেবে এটা যেন কেমন—

—কথাটা ঠিকই। আমি শুনেছি কারও কারও নাকি—কেন আমার পারুলদির কথাই জানি। বিয়ের পর তাদের ভাব হয়নি —ঝগড়া হয় খুব। পারুলদি তার বরকে মেনে নিতে পারলো না, আর বরও তাকে নিতে পারেনি মনের মত ক'রে। শুনেছি এই পর্য্যন্ত, এর কারণ আমি জানি না। তবে বিয়ের আগে মনে হ'ত বটে যে, কোথা-কার কে একজন না-দেখা না-জানা লোক, সে হবে আমার বর। তার কাছে আমার গোপন কিছুই থাকবে না ভাব-তেই যেন গা শিরু শিরু করতো। লজ্জা ভয় এসে মুখ লাল ক'রে দিত যখনই মনে আসতো তার পাশে হবে আমার বিছানা···আজ কিন্তু মনে হয় কী যে বোকা ছিলুম।



পাশাপাশি বিছানার কথা ভাবতেই

—বোকামি বলছেন কেন? এইটাই ত' স্বাভাবিক।

—না, স্বাভাবিক নয়...বিয়ে মেয়েদের জীবনকে ওলট পালট ক'রে দেয়।

—বিয়ের মন্ত্রপাঠ, সম্প্রদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানই কি বলতে চান ম্যাজিক কাঠির মত এই ওলট পালট এনে দেয়?

—কি জানি...তা বলবো কেমন করে? কতটুকুই বা জানি, তবে মনে হয় বয়েসটাও অনেকখানি দায়ী। বিয়েটা এমন বয়েসে হয় যখন আমরা মনে মনে খুব চুপে চুপে যেন একজন কারুর সঙ্গ কামনা করি।

—আচ্ছা, এক সেকেণ্ড! কত বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছে?

—সতেরো।

—সঙ্গী সাথী ত' আপনার ছিল নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, মেয়ে বন্ধু ছিল অনেক...কিন্তু আমি যা বলছিলাম, যার প্রতীক্ষা করতুম সে মেয়ে নয়, যার সঙ্গে কথা বলতে বেড়াতে হাসতে খেলতে ইচ্ছা করতো, বিয়ের মধ্যে দিয়েই তাকে পেয়েছি।

—এতক্ষণে তাহলে আপনি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এই রকম সঙ্গীলাভ করাকেই বিয়ে বলছেন?

—না, তাও ঠিক নয়...বিয়ে যেন আরও বড়, সঙ্গী ছাড়া আরও কিছু···যার কাছে দাবী করা যায় এবং দাবী করানো যায়।

—এ রকম সঙ্গী অন্য পুরুষও ত' হ'তে পারে, যেমন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যার কাছে অনেক দাবী চলে?

—না ঠিক তা নয়...এমন একটা জিনিষ আছে যা পূরণ করা কেবল একটি মাত্র পুরুষের দ্বারাই সম্ভব। সেই পুরুষ যার কাছ থেকে অসঙ্কোচে সব কিছুই নেওয়া যায় ও দেওয়া যায় তাকে...শুধু দেওয়া নয় দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

—এই দেওয়া যে বলছেন, এর মধ্যে দেহকেই কি বড় বলবেন?

—কেন বলবো না? দেহকে উপলক্ষ্য করেই ত' আমাদের সম্বন্ধ। ধরুন আমার স্বামীর মাথায় যদি মস্ত এক টাক থাকতো, আমার ভাল লাগতো না।

—আমি তা বলছি না। যদি কিছু মনে না করেন···আমি দেহের যৌন রহস্যের কথা—

—হ্যাঁ আমিও তাই বলছি—আমার মনে হয় দেহকে উপলক্ষ্য করেই সব। স্বামীর অঙ্গের ছোঁওয়া লাগলে আমার শরীর যেন কেঁপে ওঠে। একটা বিদ্যুৎ বয়ে যায় শিরা দিয়ে—এ যেন এক রহস্য।

—আপনার স্বামীরও কি ঠিক এই রকম...

—হ্যাঁ, আমায় ত' তাই বলেছে। অভিজ্ঞতা দু'জনেরই সমান। আমার মনে হয় দেহই আমাদের মন দু'টিকে কাছাকাছি এনে দেয় এবং মনও আবার দেহকে কাছে টানে।

—আচ্ছা স্বামীকে একান্তে. পেতে সংসারের দিক থেকে কি কোন বাধা পান না?

—না, সংসারের স্নেহ প্রীতির নানা পরিবেশে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলাপ ভালই লাগে। তবে আমার স্বামী শীঘ্রই সহরে বাসা করবে। তখন আমরা দু'জনে সব সময়ের জন্যে দু'জনকে পাব।

—আপনারা ছেলে-মেয়ে চান নিশ্চয়ই?

—না, এখনই আমরা তা চাই না।

—আপনাদের চাওয়ার ওপরই কি তা নির্ভর করে?

—তা নয়। এখন না হলেই ভাল, তবে ভগবান যদি দেন তা'হলে তাকে ঠেকাবো কি করে?

—ভগবান যদি কোন দিনই না দেন?

—না তা হতে পারে না...ছেলে-মেয়ে আমাদের চাইই।

—আপনি কি মনে করেন না যে, পৃথিবীতে যথেষ্ট ছেলেমেয়ে আছে?

—তা আছে, তবে আমাদেরই বা হবে না কেন?

—আপনি তাদের সংখ্যা বাড়াতে চান?

—ছেলে-মেয়ে মানুষ করবার সঙ্গতি আমার স্বামীর আছে—সুতরাং ও হিসেব আমি করতে চাই না। আমার কোলে ছেলে-মেয়ের জন্ম হবে এটা আমি চাই—মা হওয়া আমার প্রয়োজন। মা না হ'লে নারী-জন্ম সার্থক হয় না। এ বিষয়ে আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না।

—জন্মনিয়ন্ত্রণ কথাটা নিশ্চয়ই জানেন। আপনি কি তার পক্ষপাতী?

—হ্যাঁ, তবে সব সময় নয়। বিধাতার ওপরে আমি এ বিষয়ে খানিকটা নির্ভর করতে চাই।

—আপনি কি মনে করেন না যে, ছেলে-মেয়ে হ'লে স্বামীর সঙ্গে আপনার আন্তরিক সম্বন্ধ কোন রকমে ক্ষুণ্ণ হবে?

—না। বাপ মা হ'য়ে আমরা দুজনে নতুন একটা অভিজ্ঞতার স্বাদ পাব। সুখ দুঃখ সব জিনিষেরই সমানভাবে ভাগ আমরা নিতে চাই। এর জন্যে আমরা যে কোন রকম ত্যাগস্বীকার করতেও আছি—কারণ আমার স্বামীকে আমি ভালবাসি।



মা হওয়াই আমার প্রয়োজন

—ধন্যবাদ, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—এবার আপনার ছুটি। নমস্কার।

শ্রীমতী মাধুরী দেবীর কথাগুলি থেকে আমরা আমাদের অনুসন্ধানের কিছু সমাধান হয় ত' পেয়েছি। মাধুরী দেবী মোটামুটি শিক্ষাপ্রাপ্তা ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে ও বধু। "পতি পরম গুরু" মুখস্ত করা মেয়ে তিনি নন, প্রাচীন সংস্কার থেকে কিছুটা মুক্ত, আবার অত্যুগ্র আধুনিকাও নন।



—আলো-ছায়ার খেলা—

'দিল্লীকা লাড্ডু' বলে একটা কথা আছে। এটা প্রায়ই বিয়েকে বিশেষিত করতে ব্যবহার করা হয়। যাঁরা এই কথা বলেন তাঁদের মত থেকে মনে হয়, বিয়েটা এমন একটা রহস্যজনক ব্যূহবিশেষ যে, যারা এর বাইরে আছে তারা এর মধ্যে আসবার জন্যে উন্মুখ, আর যারা এর ভিতরে আছে তারা মুক্তি পাবার জন্যে ব্যস্ত।

কিন্তু সত্যই কি তাই? আমাদের দেশে যদি আইন সভা থেকে একটা আইন ক'রে দেওয়া যায় যে, সকলকেই বিবাহ-বন্ধন ছিঁড়বার

অধিকার দেওয়া হ'ল, তা হ'লে কি সকলেই দলে দলে স্ত্রী, পুত্র আর সংসার ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াবেন? আমার ত তা' মনে হয় না।

আবার আইন করে আইবুড়ো দলকে বিবাহিত করার সমান চেষ্টা যদি করা হয় তাহলেও দেখা যাবে না যে, কাতারে কাতারে পুরুষেরা টোপর মাথায় দিয়ে "কিউ" ক'রে ছাঁদনা তলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং বিয়ে সম্বন্ধে ও রকম মন্তব্য কেবল যে অনিশ্চিত মানসিক অবস্থার কথাই প্রমাণিত করে এ বিষয়ে আজ আর মতান্তর নেই। তবে অনেকে এর রোমান্টিক টীকাও করেছেন।

এক শ্রেণীর লেখকেরা প্রচার করেন—বিয়ে মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার খর্ব্ব করে। সে যেন আত্মার ঊর্দ্ধগতিকে পিছন থেকে টেনে রাখে, মনের সবগুলি পাখাকে কচ্‌ কচ্‌ করে কেটে দেয় যাতে ক'রে স্বপ্নের আকাশে মানুষ অবাধে আর উড়তে না পারে। প্রেমের মুকুল 'বিবাহের তপ্ত কটাহে' নাকি ভাজা ভাজা হ'য়ে চুঁয়ে যায়—মরণহীন আত্মার আত্মবিকাশ নাকি বিয়ের দাপটে কুঁকড়ে যায়—ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিয়ের বিপক্ষে অনেক কথাই আজ পর্য্যন্ত বলা হয়েছে—বোধ হয় এই প্রথা প্রচলিত হবার সময় থেকেই চলছে এই একশ্রেণীর মতবাদ। কিন্তু কেন?

মজার কথা এই যে, এঁরা কেউই নর-নারী মিলনের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। কিন্তু এই মিলনের মধ্যে কোন বাঁধাবাঁধি চুক্তিকে তাঁরা স্বীকার করতে চান না। অথচ কোন নির্দ্দিষ্ট চুক্তি স্বীকার করা থেকেই সুরু হয়েছে এই বিয়ের অনুষ্ঠান। পৃথিবীতে যত রকম বিয়ে আছে সবার মধ্যে কোন না কোন চুক্তি আছেই, হয় আমরণ তার জের চলে, নয় সাময়িক।

আর একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা নারীর সঙ্গে বসবাস করেও, 'নারী নরকের দ্বার' এই কথা ভুলতে পারেন না। আবার এমনি মজা যে, নারীর মোহ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তাঁদের কেউ আত্মহত্যাও করেন নি।

অশান্তিময় বিবাহিত জীবন বা অতৃপ্ত নারীসঙ্গ থেকে সাধারণতঃ এই রকম ধারণার সৃষ্টি হয়। লেখক ও ঔপন্যাসিকদের জীবনে এরকম দুর্ঘটনা ঘটলে তাদের লেখা ও রচনায় এই অহিতকর ও অস্বাস্থ্যকর মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

নারীর সম্বন্ধে সর্ব্বদেশেই অল্পবিস্তর এই রকম একটা অপ্রীতিকর ধারণা আজও আছে। অবশ্য ক্রমেই নারী সম্বন্ধে এই ধারণা বদলাচ্ছে এবং ক্রমেই ন্যায্যপথ দিয়ে চলছে।

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ইতিহাস খুঁজতে আমরা যদি গোড়ার দিকে এগিয়ে যাই, দেখবো সেখানে এক অদ্ভুত মানুষ-গোষ্ঠী—অসভ্য বর্ব্বরও তাদের বলা যায়। তারা দলে দলে থাকতে ভালবাসে, কেননা শিকার করার সুবিধার জন্য দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। শিকার ছিল তখনকার জীবনধারণের উপায়। কিন্তু এ কাজ ছিল পুরুষের, নারী যোগ দিত না এ কাজে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিচ্ছেদের সুরু এই-খানে। পুরুষ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে নারী ভার নিল সন্তান পালনের, ভার নিল ঘর-সংসারের। প্রকৃতির বশে এবং প্রয়োজনে পুরুষেরা বাইরে যেতে চায়, মেয়েরা পিছনে ঘরে থাকতে চায়, এই নিয়ে সুরু হল পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রথম সংঘাত। সংসারের মায়ায় বদ্ধ হয়ে ক্রমে মেয়েরা হয়ে দাঁড়ালো পুরুষের এই শিকার অভিযান পর্ব্বের বাধা স্বরূপ। এর জন্য পুরুষের স্বাধীনতা খানিকটা খর্ব্ব হ'ল। বিরক্তি থেকে ক্রমে দেখা দিল কুসংস্কার। শেষ পর্য্যন্ত নারীর উপস্থিতি, তাদের সান্নিধ্য, এমন কি

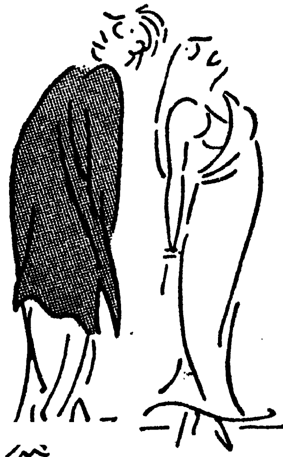


অতৃপ্ত লেখক

তাদের ছোঁওয়া লাগলে পুরুষের অস্ত্রও অপবিত্র হ'ত। নৈসর্গিক কোন বিপদ ঘটলে মেয়েদের তখন বলি পর্য্যন্ত দেওয়া হ'ত। এই ভাবেই প্রথম নারীনির্য্যাতন সুরু হয়।

নারী ও পুরুষ বিপরীতধর্ম্মী, প্রকৃতি থেকেই এটা জন্মায়। পুরুষ দলবদ্ধ হ'তে চায়—প্রথম শিকারাদি ব্যাপারে তা দেখা গেছে। তারপর যুদ্ধবিগ্রহের যুগ, সেখানেও পুরুষ দলে দলে যুদ্ধ করেছে—জয়লাভ করেছে বা মরেছে; তখনও নারী ছিল অন্য এক জগৎ নিয়ে। সে দল চাইত না, সে চাইত সংসার। দুজনের প্রকৃতির এই বিভেদ আজও স্পষ্ট রয়েছে। পুলিসের হিসাবে দেখা যায় পুরুষ চোরেরা বেশীর ভাগ দল পাকিয়ে চুরি ডাকাতি করে। কিন্তু মেয়ে চোরেরা সব সময়ই একা একা কাজ করে।

বিয়ের ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা এই বৈষম্য মেনে নিয়েছি। স্বামী আহার্য্য খুঁজে বেড়াবে, সমাজের সঙ্গে মিশবে, রাষ্ট্র দেখবে; আর স্ত্রী থাকবে সংসার নিয়ে, সন্তানাদি পালন করবে। এমন সমাজ আছে যেখানে অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন স্বামী



কেউ ছোট নয়

বাইরে মেলামেশাও করে দুজনে। আবার কোন কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় নারীদের কর্তৃত্ব—মেয়েরা কাজ করে, সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা করে—পুরুষ বসে থাকে, ভৃত্যের মত হুকুম শুনে যায় মাত্র।

বিয়ে পৃথিবীর বহু বিচিত্র জিনিসের একটি। নর ও নারীর মিলনের

ব্যবস্থা যে কত রকম আছে তার ইয়ত্তা নেই। বিয়ে সম্বন্ধে আধুনিক যে ধারণা তাতে স্বামী ও স্ত্রী অধিকার হিসাবে কেউই ছোট থাকবে না এবং উভয়ের স্বাধীনতাও পরস্পরের কাছে স্বীকৃত হয়েছে।

আমাদের শাস্ত্রে গার্হস্থ্যকে ধর্ম্ম বলা হয়েছে। বিবাহিত জীবন শুধু ধর্ম্মাচরণের জন্য—এই রকম নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। স্ত্রীকে সহকর্ম্মিনী বা সহমর্ম্মিনী হিসাবে নেওয়ার থেকে সহধর্ম্মিনী আখ্যা দিলেই মনে হয় ঠিক বলা হ'ল।

পুরাযুগের বিবাহের মূল আদর্শ আর নেই। এখন তা চলতেও পারে না। কিন্তু আমরা সব চেয়ে প্রাচীন ছোট খাটো আচার বিচার আর প্রথাগুলিকে মহাসম্মানে বাহাল রেখেছি এখনও। এদিকে আধুনিক যুগধর্ম্মের চাপে বিবাহের মানে দাঁড়িয়েছে অন্য রকম।

অধিকারের কোন প্রশ্নই এখানে যেন উঠতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর অনেক সম্পত্তির মধ্যে একটি, এই ধারণা অনেকটা আগেকার নিয়মেই চলছে। এমন সময় গেছে যখন স্ত্রীরা স্বাধীনতা চাওয়া দূরের কথা কোন অধিকার চাইতেও ভুলে যেত। পুরুষ-সমাজ যত্ন ক'রে তাদের এই অধিকার-হীনতার কথা ভুলিয়ে রাখতো—'পতি পরম গুরু' ইত্যাদি অনেক বুলি মুখস্থ করিয়ে।



বিয়ে থেকে সরে থাকার চেষ্টা

আমি অবশ্য সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে বসিনি। কিন্তু আজ-কাল দেখি এই প্রথার ও বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়ার ফলে মেয়েরা অন্য কথা বলতে যাচ্ছে। আর্থিক স্বাধীনতা যে-সব মেয়েরা পেয়েছে তারা সহজে বিয়ে করতে রাজী হয় না। অনেকটা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়েই।

যাদের বিয়ে হ'ল

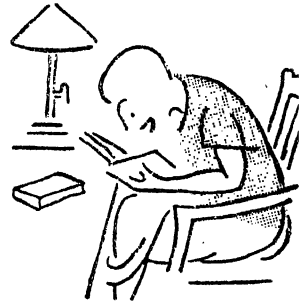
অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন আজকাল সাধারণতঃ ছেলেরা বা মেয়েরা যে জন্যেই হোক বিয়ে থেকে সরে থাকবার চেষ্টা করে। বিয়ের উপযুক্ত বা আরও বড় কোন ছেলেকে যদি বিয়ের প্রস্তাব করা যায় সে বলে উঠবে—বিয়ে করবো না—বেশ আছি আরামে, ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চাই না—ইত্যাদি। দায়িত্ব এড়াবার জন্যে তারা ব্যস্ত। বোঝা বইবার ভয়ে তারা যেন আড়ষ্ট। অর্থনৈতিক চাপ থেকে এ মনোভাব অসম্ভব নাও হ'তে পারে। স্ত্রীকে ওরা প্রায় দেনার মতই ভয় করে। কুমারী মেয়েদের এ প্রশ্ন করলে হয়ত ঠিক সমান উত্তর পাওয়া যাবে না, তবে প্রগতিশীলাদের বিয়েতে অসম্মতিই স্বাভাবিক। স্বামীর কাছে স্ত্রীর আত্মলোপকে অনেক মেয়েই ছোট ক'রে দেখবে—এর একটা দাসত্ব জাতীয় নাম দিতেও তারা পিছপা হবে না।



প্রজাপতিকে অস্বীকার করে

অবশ্য এ ধরণের মতের মেয়েরা সংখ্যায় কম—কেন না গৃহ ও সংসারের আবেষ্টনে যারা মানুষ তারা এইটুকুই জানে যে বিয়ে মেয়ের পক্ষে অপরিহার্য্য ধর্ম্ম।

বিয়ে ও বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে ছেলে ও মেয়েদের জ্ঞান খুব বেশী নয়। তারা যেটুকু শেখে তা বাড়ীতে, বই পড়ে বা বিবাহিত বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে। এই তিনটি জায়গা থেকেই তারা যা শেখে তাই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হ'য়ে থাকে অথচ এই শিক্ষা মোটেই পূর্ণ ও পর্য্যাপ্ত নয়।



বই পড়ে শেখে


আত্মীয়-স্বজনের কাছে শেখা

শিক্ষার অল্পতা তরুণ মনের উচ্ছ্বাসের পিছনে লুকিয়ে থাকে। হিসাবের ফাঁক ধরা পড়ে না অনুরাগের প্রথম পদক্ষেপে।

আমাদের পাশের ফ্ল্যাট থেকে একটি উদাহরণ দিলে মন্দ হবে না। বিবাহ ও তার ক্রমপরিণতি যা আমরা পাশ থেকে দেখছি।—মিঃ সেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন এই ফ্ল্যাটে। বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার গোছালো ঘর দোর। এখন তিনটি পুত্রকন্যা হয়েছে। কিন্তু প্রথম যখন আসেন সে একেবারে বিয়ের পরই। মিসেস্ সেনের সঙ্গে বিয়ের পূর্ব্বে তাঁর আলাপ ছিল না বলেই শুনেছি! সুতরাং বাপমার ঠিক করা আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু বিবাহ বলতে হবে। পূর্ব্বে দুজনেই নাকি বিয়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন—নির্ভেজাল প্রেমে তাঁদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু বিয়ের জটিল আবর্ত্তে তাঁদের কেউ পা দেবেন না—এই ছিল পণ। তারপর কেমন ক'রে জানিনা তাঁদের মত ফিরলো এবং একদিন সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে শাঁক বেজে উঠলো। মিঃ ও মিসেস্ সেন বিবাহিত হয়েই কলকাতায় আসেন এবং এই ফ্ল্যাটেই।

প্রথম বছরের কথা বলি ঃ দুজনের কলকূজন প্রায়ই শোনা যেত, হাসি বিদ্রূপের নানা ভঙ্গিও প্রায় কানে আসতো। সেন স্নানের ঘরে বেশ নিয়মিত ভাবেই গলা ছেড়ে গান করতেন।

দ্বিতীয় বছরও এইভাবে গেল—মাঝে মাঝে সেনের গলা শুনতাম, প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত গলা—'কী অপূর্ব্ব রেঁধেছ মীরা! তোমার হাত দুখানা সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে ইচ্ছে কচ্ছে!' ইত্যাদি—

এই ভাবে দিন যায়। তাদের দ্বিতীয় বিবাহ-জয়ন্তী হ'য়ে গেল।


গলা ছেড়ে গান

বিবাহ তৃতীয় বৎসরে পা দিল। এখন আর সেনের গান শুনি না। কলকূজনের মাত্রা বারো আনা ভাগ কমে গেছে।

তুজনের মিলিত কণ্ঠস্বর কমই শোনা যায় এখন। বরং মাঝে মাঝে সেনের চড়া ঝাঁঝালো আওয়াজ কানে আসে। মাংস রান্না ঠিক হয়নি ব'লে একদিন স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি বকুনি খেতে হ'ল। যখন তখন মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার প্রমাণ পেতাম। মিসেস সেনও যে সব সময় চুপ ক'রে থাকতেন তা নয়, তিনিও কৈফিয়ৎ চাইতেন। আরও পরে দেখা গেল মিঃ সেন অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরেন—অকারণে ভজুয়া চাকরটা ধমকানি খায়—অনর্থক আলোগুলো জ্বালা থাকে—এই রকম কত কি অনর্থ ঘটে।


আর গান শুনি না

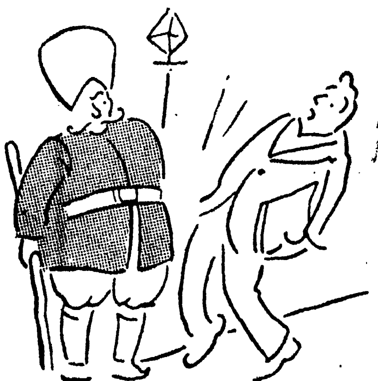
সেন নাকি কোন ক্লাবে যায়—কোন বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা—এই নিয়ে কথা কাটাকাটি চলে। একদিন বরদা মিত্তিরের বেয়ারা সকালে মিঃ সেনের অ্যাটাচি কেসটা দিয়ে গেল। তিনি রাত্রে নাকি ওটা ফেলে আসেন তাদের বাড়ীতে। বরদা মিত্তিরের আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়েটা আবার একটা স্লিপ লিখে



মাংস রান্না ঠিক হয় নি

পাঠিয়েছে ঐটার সঙ্গে। সেইদিন রাগারাগির আর অন্ত রইল না, তিনদিন গুমোট হয়ে রইলো বাড়ীটা।

সেন তখনও সন্ধ্যা-পলাতক। বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র আনন্দের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। একদিন গভীর রাত্রে ক্লাব থেকে ফেরার পথে এক বদমেজাজী কন্‌ষ্টেব্‌লের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয়। অপদস্থ মর্ম্মাহত হয়ে বাড়ী ফেরেন সেন। এদিকে মিসেসও নাকি ঠিক সেদিনই স্বামীকে পাবার একটা শেষ চুশ্চেষ্টা করতে বসে-ছিলেন। প্যাক্ট হ'তে বিলম্ব হ'ল না। তাঁদের অধরোষ্ঠ মিলনের কোন সংবাদ পাইনি বটে কিন্তু পাশ থেকে যা কানে এল সেটা ওঁদের গ্রামোফোন—অকারণ পুলকে সেটা কেবলই প্রেমসঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছিল।



কনষ্টেব্‌লের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি

সেনের যখন প্রথম পুত্র সন্তান হয় তখন তাদের বিয়ের চতুর্থ বৎসর। তারপর আরও তিনটি বছর কেটে গেছে—এখন তাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে। চুজনে চুজনকে ভাল ক'রে চিনেছেন—তবুও এখন বচসা হয়, খিটিমিটিও চলে। তবে আগের মত বিছানায় শুতে গিয়ে ঠাণ্ডা হাত গায়ে লাগলে যে তুমুল ঝড় বয়ে যেত এখন আর তা হয় না। ছেলেমেয়ে প্রসঙ্গ নিয়ে, কত কি খুঁটিনাটি নিয়ে মতভেদ হয়, আবার মিটে যায়—আবার মধুযামিনীর

চাঁদ ওঠে। এইভাবে চলে তাঁদের মেঘ ও রৌদ্রের মুহূর্ত্তগুলি। সহ্য করেন দু'জনে অনেক, আবার ভুল বুঝে অনর্থও করেন প্রচুর!

মাঝে মাঝে রাগের আতিশয্যে সেন কত কি কথা বলে ফেলেন— মনে মনে ভাবেন তার থেকে আরও বেশী। অন্য মেয়ের সঙ্গে তাঁর যদি বিয়ে হ'ত তাহ'লে আজ তিনি কত সুখী হ'তে পারতেন। আরও সুন্দরী মেয়েও ত তিনি পেতে পারতেন স্ত্রীরূপে। শুধু সুন্দরী কেন, যে কোন মেয়ে তাঁর জীবনকে সুখী করতে পারতো। সৌন্দর্য্য দেখলে তিনি চকিত হয়ে ওঠেন, কারুর স্ত্রীর প্রশংসা শুনলে তিনি গুমরে ফেটে পড়তে চান। ভাবতে ভাবতে হয়ত বেরিয়ে পড়েন বাড়ী থেকে। সিনেমা হাউসের দিকে পা বাড়ান। মনের জটগুলো পাকিয়ে ওঠে। বিয়ে না করলেও যথেষ্ট সুখে তিনি দিন কাটাতে পারতেন। স্বাধীন বলাকার মত উড়তে পরতেন আকাশে। অনুতাপ আসে—তাই উচিত ছিল তাঁর.........

আবার কোনও মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল হ'য়ে তিনি ধরা দেন। মনের জটগুলো উল্টোপাল্টা জড়াতে সুরু করে। তিনিও উল্টো ভাবেন। ভাবেন দোষে গুণে হ'লেও মীরাকে পেয়ে তিনি সুখী হয়েছেন—মীরার ছোট বড় গুণগুলি মনে পড়ে যায়। তার সেবা তিনি ভুলতে পারেন না। তার মত আন্তরিক যত্ন তিনি পাবেন কোথা?



স্ত্রীর গললগ্ন হ'য়ে যান

আরও বিগলিত হয়ে কোনও সময় হয়ত তিনি স্ত্রীর গললগ্ন হ'য়ে যান এবং নিজেকে সুখী বলেই মনে করেন। অন্ততঃ আরও যে তিনি অসুখী হ'তে পারতেন তা' থেকে বাঁচিয়েছে মীরা!

সেনের পরবর্ত্তী বছরগুলি হয়ত এইভাবে দোলায়মান হয়ে চলবে। ক্রমে সহ্যশক্তি ও অভিজ্ঞতা এসে তাঁদের ছোট খাট অসুবিধাগুলি ভেঙ্গেচুরে দেবে।

মেঘ ও রৌদ্রের খেলা নিয়ে বিবাহ-জীবনের মধ্যম শ্রেণীর ছবি এটি।



পাওনাদারের বিল বা মাসকাবারী
ফর্দ্দ দুটোই সমান মারাত্মক



লজ্জা কিসের নতুন বউ ?

বাপ মা যেখানে ছেলেমেয়েদের বিবাহ স্থির করেন—পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন ব্যাপার সেখানে একটু জটিল না হ'য়ে পারে না। বাপ মা বা অভিভাবক জাতীয়দের হাতে যখন বিবাহের ভার থাকে তাদের অনেকগুলি বিষয়ে মাথা ঘামাতে হয়। তাদের মতামত নির্ভর করে অনেক জিনিষের ওপর। সমাজের অনুশাসন, কুলমান বংশ ইত্যাদির অনুশাসন এবং নিজের রুচির অনুশাসন। তারপর অর্থনৈতিক দিকটাও বড় ব্যাপার। এতগুলি অনুশাসনের নির্দ্দেশ মেনে পাত্র বা পাত্রী

হয়ত পাওয়া গেল কিন্তু মিললো না হয়ত বয়স বা রাশি, গণ কিম্বা কোষ্ঠির আর কিছু! কুল মান বংশ যদি বা মিললো রূপ কিম্বা যোগ্যতা হয়ত পাওয়া দুর্ঘট হ'ল। তাই মেয়ে দেখা ও ছেলে দেখা আমাদের সমাজের বিবাহের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়।

'খ্যান্ত মা, একটু সেজেগুজে আয় ত মা'—বাপ ঘরে ঢুকেই প্রাপ্ত-বর্ষীয়া মেয়ের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করলেন।

খ্যান্ত গরীব গৃহস্থের মেয়ে। নিজেকে দেখানোর অভিনয় কত-বার সে করেছে, ক্লান্ত হয়েছে, তবুও রেহাই নেই। আয়না নিয়ে বসে সে।

বাইরের ঘরে দামী সিগারেটের সৌরভ বাড়ীর ভিতর থেকেও অনুভব করা যায়। সহর থেকে নাকি খ্যান্তকে দেখতে এসেছে—সকলেই বেশ একটু সন্ত্রস্ত।

গুটিশুটি পায়ে কমদামী বেনারসীর আঁচলটা আঙুলে জড়িয়ে পা ঘসতে ঘসতে খ্যান্ত এসে বসলো একটা নমস্কারের ইঙ্গিত জানিয়ে।

'আপনার নাম?' একটি ভদ্রকণ্ঠের প্রশ্ন।

'কুমারী খ্যান্তমণি দেবী'। কণ্ঠে যথেষ্ট জড়তা।

'রাবিশ্‌ সেকেলে পচা নাম।' একজনের তীক্ষ্ণ মন্তব্য শোনা গেল।

'এডুকেশন?'

খ্যান্ত বোধ হয় পিতৃপক্ষ থেকে উত্তর আশা করছিল, বিলম্ব হ'ল।

'মিউজিক? গান, এসরাজ পিয়ানো অর্গান কোনও রকম বাজনা জানেন?' 'ডান্স? ফিগার ভাল, ডান্সের সুযোগ ছিল'। 'খেলাধূলা? ব্যাডমিণ্টন, পিংপং......'

প্রশ্নের পর প্রশ্ন—চোখা চোখা তীরের মত।

'মেয়েটাকে নষ্ট করেছেন, মানুষ করেননি ত, পুটলি পাকিয়ে রেখেছেন' বলে সবাই উঠে পড়ে......

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে গরমিল তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই চিত্রে। আবার এর বিপরীতও দেখা যায়।

পাড়াগাঁয়ের পাত্রপক্ষ বিত্তবান প্রগতিশীল আধুনিক পরিবারে যখন

পাত্রী নির্ব্বাচনে যান। প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে সায়েবিরুচিতে সাজানো সরঞ্জামের মধ্যে পাত্রপক্ষ কৌচের ওপর আসন নিয়েছেন। ভাল ক'রে বসতেও তাঁদের সঙ্কোচ।



জড়তার লেশ মাত্র নেই

টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে মেয়েটি ঢুকলো ঘরে। জড়তার লেশ মাত্র নেই। পায়ে হিলতোলা জুতো, সাড়ীখানা পেঁচিয়ে গায়ের সাথে লেপ্টানো।

'নামটি কি মা তোমার?' থতমত খেয়ে একজন প্রশ্ন করেন।

'বেবী বনার্জ্জি' এক মুহূর্ত্ত দেরী হয় না উত্তর দিতে।

'ঠাকুরের নাম কি মা তোমার?'

'ঠাকুর? ওঃ বাবার নাম, মিঃ উমেশ বনার্জ্জি।'

'রান্নাবান্না সব শেখা আছে?'

'ওসব স্ল্যাষ্টি প্রশ্ন আমায় করবেন না। আমায় নিশ্চয়ই রাঁধুনির কাজ দেবার জন্য বাবা বিয়ে দিচ্ছেন না।'

'না না না তা নয়—তবে মা ঘরের কাজ কর্ম্ম—'

'ঝি চাকর আরদালিরা রয়েছে কি করতে?' ঝাঁঝালো উত্তর আসে। মেয়েটি এবার স্পষ্টভাবেই জিজ্ঞাসা করে। 'হ্যাঁ বাই দি বাই, আপনাদের ছেলের ইন্‌কাম্‌ কত? তিনশো টাকার কম হ'লে আমার সঙ্গে বিয়ে অসম্ভব। তা ছাড়া কলকাতায় বাড়ী টাড়ী আছে কিনা তাও আমার জানা দরকার।'

অপরপক্ষ শুধু হতাশভাবে তাকিয়ে থাকে।

হাতের ছোট রিষ্টওয়াচটার দিকে তাকিয়ে বেবী উঠে পড়ে।

এ রকম বিয়ের প্রস্তাব মুকুলেই ঝরে পড়ে। ঝরে না পড়লে বিপদ বাড়ে ছাড়া কমে না।

আজকাল পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন ব্যাপারটা অনেক সময় খবরের কাগজের মারফত সেরে নেওয়া হয়—এটা নাকি আরও বৈজ্ঞানিক উপায়। ম্যাট্রিমোনিয়্যাল কলমে বিয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে এর মধ্যে বেশ চমকে-দেওয়া নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের মধ্যে অনেক সময় বেশ কাব্যের ছাঁদও থাকে এবং চাহিদার ফর্দ্দটা লম্বা ক'রে দেওয়া থাকে বিশেষ ক'রে যখন প্রয়োজন হয় পাত্রীর।

একটি নমুনা দিচ্ছি—'পাত্রী আবশ্যক—অপরূপ সুন্দরী (রং সত্যিই খুব ফর্সা হবে, গড়ন লম্বা ছিপছিপে পাতলা, চোখ মুখ ভাল এবং হাবভাব স্মার্ট) শিক্ষিতা, শিল্পকর্মে নিপুণা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া হওয়া চাই। বয়স উনিশের বেশী হ'লে চলবে না। গান বাজনা ও নৃত্যে দক্ষতা বাঞ্ছনীয়। ধনী পিতার একমাত্র কন্যা হইলেই ভাল হয়। যৌতুকের দাবী নেই।'

পাত্রপক্ষ সবদিক থেকে মিলিয়ে যদি এ রকম নিখুঁত কোন পাত্রী পেয়ে থাকেন আমাদের বলবার কিছু নেই কিন্তু শতকরা ক'জন এ রকম পাবেন সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

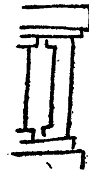
'লভ্‌ অ্যাট ফার্ষ্ট সাইট' বলে পুরোনো একটা কথা আছে। ফার্ষ্ট সাইটে লভ্‌ হ'তে পারে কিন্তু বিয়ে হয় খুব কমই।

আগে এটা ঘটকদের একচেটে কাজ ছিল, এখন ঘটকের নানা

সংস্করণ বেরিয়েছে। প্রজাপতি অফিসও তার মধ্যে একটি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু বৌদিদি, বোন আর বন্ধুদের মারফৎ যে বিয়ে পেকে ওঠে—শুভ আলাপের ভূমিকা যেখানে ছাদনাতলার পরিশিষ্টে দাঁড়ায়, বিবাহের ব্যাপার সেখানে মধুরই হয়। পাশাপাশি বাড়ীর ছেলেমেয়ের প্রণয় কখনো কখনো পরিণয়েও পরিণত হয়! জানালা বারান্দা কিম্বা ছাদটা এখানে ঘটকালীর কাজটা এগিয়ে দেয়। অবশ্য জানালা-প্রেমের কয়টাই বা দাম্পত্যে পৌঁছয়?








বারান্দা প্রেমের পরিণতি

হিন্দু সমাজে বিয়েটা বিধাতার বা প্রজাপতির কাজ ব'লে আমরা ধ'রে নিয়েছি। কেননা একটা বিয়ে হ'তে অনেক 'কাঠ খড়' পোড়াতে হয়। 'লাখ কথা' না হ'লে বিয়ের শাঁখ নাকি বাজে না। বছরের পর বছরের চেষ্টায় হয়ত কোনও বাড়ীতে প্রজাপতিকে টলানো গেল না আবার অপ্রত্যাশিত কত বিয়ে অকস্মাৎই হয়ে যায়, পাড়ার লোকেও তার সাড়া পায় না। এত অনিশ্চিত বলেই একমাত্র শুধু দেবতারাই ওর হদিস বলতে পারেন।

আমার এক বন্ধুর কথাই বলি। সোজা বত্রিশ বছর অবধি অবাধে 'আইবুড়ো' অবস্থায় কাটিয়ে সে বুঝতে পারলো বিয়ের সমগ্র সম্ভাবনা কেটে গেছে। বাড়ীর তাড়া, আত্মীয় স্বজনের হিতোপদেশ, বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ সবই গেল বিফল হ'য়ে। এমন কি পরিচিতা অপরিচিতা গুটি ছয়েক মেয়ের চটুল চাহনিও তাকে বিবাহের সিংহদ্বারে নিয়ে যেতে পারল না। সব যুক্তি সে অবলীলাক্রমে কেটে দিল এক কথায়, 'ভাল ক'রে আগে রোজগার করি তারপর সব হবে........'

এক ভীষণ নামডাকওয়ালা ঘটক তার পিছু নিল—এবং ছমাস ধরে ঘুরেছিল। অনেকগুলি কন্যাদায়-পীড়িত পিতাও তাকে অপরিমিত প্রলোভন দেখিয়ে রাজী করতে না পেরে ফিরে গেল। 'ভাল মেয়েই বা কোথা' বন্ধুবর এই নতুন যুক্তি দিয়ে কাউকেই আমল দিল না। ঘটকপ্রবর হাল ছেড়ে দিয়ে সবে মাত্র বিদায় নিয়েছে, এমন সময় একদিন এক পত্র পেলাম। 'শ্রীমান...........এর বিয়ে...... তারিখে হঠাৎ হ'য়ে গেল, লিখতে এই দেরী তার জন্যে ত্রুটি মার্জ্জনীয়। তবে বৌভাতে কিন্তু আসা চাইই ইত্যাদি......'

বিস্মিত না হ'য়ে পারলুম না। পরে খবর নিয়ে জানি যে বন্ধুবর মদন দেবেরই বাণাহত হ'য়ে জর্জ্জরিত হয় এবং ফলে সহসা তার দীর্ঘপুষ্ট ভীষ্মত্ব বিসর্জ্জন করে। বুঝলাম প্রজাপতিকে এই জন্যেই লোকে খেয়ালী দেবতা বলে।

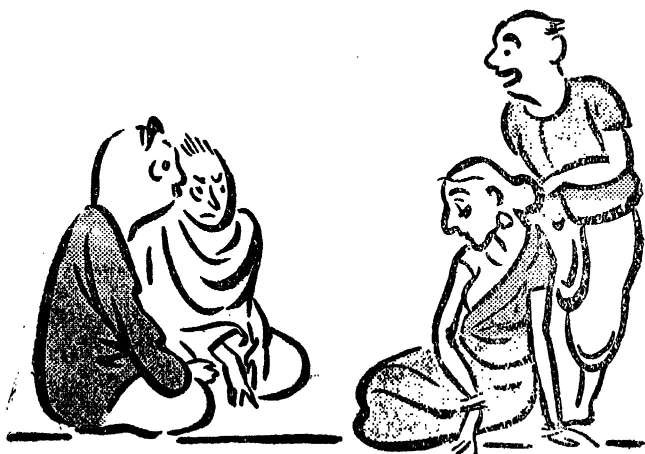
যা হোক আজকাল অবশ্য বড় পাত্রপাত্রীর পক্ষে দেখে শুনে বিয়ে করার উপদেশ অনেকেই দেন। এই দেখা শোনা'র ওপরই নাকি তাদের ভবিষ্যৎ বনিবনা অনেকখানি নির্ভর করে। কেননা হিন্দু বিয়েতে মেরামতের উপায় কমই।

'বিয়ের পর যদি বনিবনা না হয়?' এরকম প্রশ্নের উত্তরে একটা গল্প বলতে হয়। একজন পাইলট একটি লোককে উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল: 'আচ্ছা এই প্লেনে ক'রে যে উড়ি, ভাব দেখি দু'হাজার ফুট উঁচু থেকে যদি প্লেনটা পড়ে যায় তাহলে কি করবো তখন?'

'কেন? রিপেয়ার করিয়ে নিলেই পার' নির্বিকার ভাবেই লোকটি উত্তর দেয়।

পাত্র ও পাত্রীর বয়েস নিয়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। পাত্রীর বয়েস কমিয়ে বলার একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়।

মেয়ে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ পিতৃদেব হয়ত বলে ফেললেন—'খুকীর বয়েস বেশী না, ওকে দেখায় বেশী, এই মাঘে ও তেরয় পা দিয়েছে।'



খুকীর বয়েস বেশী না

পাত্রের তরফ থেকে অনেক সময় উল্টো হয়। অল্পবয়স্কের বয়স বাড়িয়ে মিল করাবার চেষ্টা মাত্র। ফলে এমন দেখা যায় যে, বিয়ের পরে আবিষ্কার হ'ল যে বর ও কনে প্রায় সমবয়েসী।

কোষ্ঠি ও ঠিকুজি হিন্দু সমাজের বিয়েতে গভর্ণরের মত ক্ষমতা রাখে। সবদিক থেকে সুন্দর যোগাযোগ হ'লেও কোষ্ঠির দৃঢ় মুষ্ঠি যে কোন বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারে। আবার শত বাধা সত্ত্বেও দু'জনের গাঁটছড়া একমাত্র কোষ্ঠিই বেঁধে দিতে পারে।

বিবাহ-আকাশে আর একটি দুষ্টগ্রহ হচ্ছে পণপ্রথা। রক্তবীজের

মত এর মৃত্যু অনেক আগে থাকে আরম্ভ হয়েও আজও শেষ হ'ল না। কত পাত্র পাত্রী যে এর পাষাণ-পায়ে মাথা খুঁড়ে নিজেদের বলিদান দিয়েছে তার সংখ্যা নেই। বংলা সাহিত্যেও এই নজীরের অভাব নেই। একা শরৎচন্দ্র বারবার শক্তিশেল হেনেছেন কিন্তু তাই বুকে নিয়ে আজও এই দুষ্ট প্রথা সমানে বেঁচে আছে।



অশীতি-পঞ্চদশী দুর্ঘটনা

পাত্র পক্ষের লোভের মাত্রা সীমাহীন হয়ে অনেক আদর্শ বিবাহ পণ্ড হ'য়ে গেছে। অসমর্থ পাত্রীপক্ষ যে কত সময় অরক্ষণীয়া মেয়েকে পঙ্গু ও বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিপত্নীক ধনী বৃদ্ধ যারা বিবাহার্ত্ত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে—পণ-প্রথা তাদের কানে আশার বাণী শোনায়। প্রলুব্ধ বালকের মত একদিন সবার অজ্ঞাতে সে এক পঞ্চদশী কি ষোড়শীর হাত ধরে খিড়কি দিয়ে ঘরে ওঠে। তখন গৃহধর্ম্মের অজুহাত তার মুখে। রবীন্দ্রনাথের সেই ছত্রটি—

আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম্ম
কিন্তু গৃহধর্ম্ম
স্ত্রী না হ'লে অপূর্ণ যে রয়
মনু হ'তে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।

আমরা অবশ্য মঞ্জুলিকার বাপকে দোষ দিই না। যৌনজীবনের একটা বিকৃত অধ্যায় আছে যেখানে ন্যায় নীতি ও সভ্যতার চিরকালের জন্য প্রবেশ নিষেধ।

যে সদর দরজা দিয়ে পণপ্রথা প্রবেশ করে তারই খিড়কিদ্বারে সয়তানের দুটি হাত। তাই দিয়ে হাতছানি দেয় সে। একহাতে তার আত্মহত্যা আর এক হাতে ইলোপমেণ্ট। আত্মহত্যার দুর্ঘটনা ইদানীং কিছু কমলেও দ্বিতীয় হাতের কাজ বেড়ে গেছে। যে বয়েসে তরুণ মন উদ্দাম উদ্বেল হয়ে ওঠে সেই বয়েসে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ না দিয়ে মানুষের সংস্কার যদি পাথর চাপাই দিতে চায় তাদের তাহলে সেই চাপ এড়িয়ে তারা যে মুক্তির আকাশ খুঁজবে সেইটাই স্বাভাবিক। পরিণামের ভয় দেখবার


ইলোপমেণ্ট

ফুরসুৎ তখন তাদের থাকে না। কিন্তু সত্যিই যখন পরিণাম মর্ম্মান্তিক হ'য়ে দেখা দেয় তখন তারা চোখে হাত চাপা দেওয়া ছাড়া আর পথ পায় না।

দৈবাৎ সৌভাগ্য এই দলের প্রেমিকদের কোলে তুলে নেয়। তখন তারা অভিভাবকদের অনুমতি আর সমাজের ছাড়পত্র একই সঙ্গে পেয়ে যায় অকাল পুষ্পবৃষ্টির মত।

অনেকের মতে এই জাতীয় পূর্ব্ব-আলাপ বা প্রণয়জাত বিবাহ খুব সুখের। এ বিষয়ে সোজা রায় দেবার মত অভিজ্ঞতা নেই আমার। পাশ্চাত্য সব দেশেই এই প্রথার চরম বিকাশ দেখা যায় কিন্তু তার ফলে সেখানে যে অন্তদেশের তুলনায় শতকরা বেশী লোক সুখী এমন হিসাব আমি পাইনি। বিবাহ প্রথার কোনটা খারাপ কোনটা ভাল চোখ বুজে বিধাতাও বোধ হয় বলতে পারেন না। সমাজ, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার ও আচারের ওপর নির্ভর করে এটা সম্পূর্ণ। দেশের আবহাওয়ায় স্বভাবের মন্থর গতিতে যা গড়ে ওঠে তাই হয় স্বাভাবিক। সেখানে

তাই কল্যাণকর। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই এটি পরিবর্ত্তনের রাস্তায় আপনিই চলবে। তবে অনেক পরাধীন দেশে দেখা যায় শিক্ষার সঙ্গে সংস্কারের রূপান্তর ঠিক সমান তালে হয় না। শিক্ষা যায় এগিয়ে, মনে জ্ঞানের আলো এসে পড়ে কিন্তু প্রতিদিনকার জীবন তার সংস্কারের সহস্র শিকড় দিয়ে আঁকড়ে থাকে আচার বিচারের সমস্ত পুরানো খুঁটিমাটিগুলিকে।

যেমন আমাদের সনাতন গৌরীদানের দেশে আজ অষ্টাদশীদান চলছে অবাধে—কিন্তু গৌরীদানের প্রথাতেই সব সম্পন্ন হয়। এমনই মজা। যে বাড়ীতে মহাধুমধামে একটি গৌরীদান ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল তারই পাশের বাড়ীতে হয়ত দেখি পরিণত বয়সের কোর্টশিপ করা এক বিবাহ হ'ল। দুটিই সমাজের অন্তর্ভুক্ত।

একটি গ্রাজুয়েট মেয়ের সঙ্গে মনে করুন একজন প্রফেসারের বিবাহ হিন্দুপ্রথাতেই হচ্ছে। আপনি কি আশা করেন স্ত্রী-আচারের সময় কিছু ভিন্ন দৃশ্য দেখবেন? মোটেই না। পাশের ঘরে রেকর্ডে হয়ত বিলিতী জাজ্ মিউজিক বাজছে, টেবিল চেয়ারে হয়ত বিদেশী কায়দায় অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা হচ্ছে। কিন্তু বিবাহের আচার নিয়ম সেই অতীতের প্রথা মতই চলবে। সাত পাকের বদলে আট পাক ঘুরবে না। অনুষ্ঠানের



সাত পাক-ই ঘুরবে

কোন ত্রুটিই হয় না। মানে না বুঝলেও আমরা চোখ কান বুজে এগুলো কোন গতিকে পেরিয়ে যাই। অবশ্য অধিকাংশ নিয়মগুলিরই

যে বেশ মধুর মানে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। যেমন ধরুন শুভদৃষ্টি বা বাসর।

কুমার কুমারীর বিবাহপূর্ব্ব জীবনে আলাপ বা প্রণয় থাকুক না থাকুক এবং বিবাহ প্রথা যাই হোক, বিবাহ যখন হ'ল তখনই তারা একটি শ্রেণীর মধ্যে আসে। তাদের নিয়েই আমাদের কথা। বিবাহের পরেই কুমার তার যৌবনের স্বপ্ন নিয়ে বাস্তবের একখানি মূর্ত্তির হাত ধরলো। আর যার হাতে সে হাত মেলালো তারও দুইচোখে রঙীন স্বপ্ন।

বিবাহের অনুষ্ঠানে বিধি বিধান এত জটিল ও বিচিত্র বটে কিন্তু সকলকে আনন্দে মাতিয়ে রাখবার এটি বেশ একটি কৌশল। আত্মীয় নিমন্ত্রিতের ভিড়—সবার মুখে চোখে আনন্দের রং! সাড়ী ও গয়নার প্রদর্শনী বসে যায় যেন, ছেলেমেয়েদের মেলা আর বয়স্কদের রসালাপের কম্পিটিশান! হাসি ও আনন্দ, আলো ও সঙ্গীত, রঙ্গ-রস ও উৎসব সবগুলি দিয়ে যেন বিবাহ ব্যাপারটি সিল করা, পাটে পাটে মোড়া।

বর-বধূ সেদিন রঙীন রাত্রির যেন নায়ক নায়িকা। তাদের কেন্দ্র ক'রে যা কিছু।

স্ত্রী-আচার প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার অত্যাচারেরই নামান্তর বিশেষ। সারাদিনের উপবাসী ক্লান্ত শরীরে প্রতীক্ষমান মনটি আর কতক্ষণ ধৈর্য্য ধরতে পারে? তার ওপরে তাকে খোঁচা দেওয়ার জন্য ব্যঙ্গ-রঙ্গের কত রকম আয়োজন। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গবার আগে তাই শুভদৃষ্টির আয়োজন। ক্ষণিকের জন্যে চারিটি চোখ পলকে তুলে একবার তাকাল'। শাঁখের আওয়াজ আর হাজার কণ্ঠের কলরবে শুভদৃষ্টির রেশটুকু ডুবে গেল। কিন্তু যা রইলো তা দিয়ে পরস্পরের স্বপ্নজগতে যুগান্তর আসতে বাধ্য।

যে কুমারী রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখেছে সারা কৈশোর ধরে সে হয়ত দেখলো রাজপুত্র ত' নয়ই তার জ্ঞাতি গোষ্ঠিও নয়—অজানা অচেনা পরিণত বয়সের ভারিক্কি একটি মানুষ। তাকে যেন দেখেছে সে রাস্তায় কিম্বা বাজারে—মুদীর দোকানে হয়ত বা বসা উচিত ছিল তার কিম্বা আর কিছু—



দেখে হয়ত ভারিক্কি একটি মানুষ

আবার কুমার যে তন্বী রূপসী রাজকুমারীর প্রতীক্ষা ক'রে তার কৌমার্য্য কাটিয়েছে, দৃষ্টির শুভক্ষণে সে যা দেখলে তাতে তার স্বপ্ন যায় টুটে। হয়ত বেচারা কাঁদ কাঁদই হয়ে ওঠে।

লটারীর টিকিটে টাকাপ্রাপ্তির মত অতি অনিশ্চিত—অকস্মাৎ ভাগ্য-ক্রমে হয়ত উভয়ের স্বপ্নজগৎ রঙীন হয়ে উঠে।

বাপ কি দাদার, খুড়ো কি জ্যাঠার পছন্দ করা পাত্র বা পাত্রী দৈবাৎ পরস্পরের মনোজগতে রঙের ছোপ লাগায়। টাকা ও সোনার পাল্লার একদিকে যে কন্যাকে বসিয়ে সম্প্রদান করা হয়—বরপক্ষের চোখে সে পাত্রীর দৈহিক ত্রুটি ঢেকে যায় অর্থের জৌলুষে।

কোষ্ঠির রাজযোটকে হয়ত এমন পাত্র স্থির হ'ল যাকে দেখে পাত্রীর মা অবধি আঁৎকে উঠলেন। গোপনে অশ্রুমোচন করা ছাড়া মা ও মেয়ের আর কিছু করার থাকলো না—এরূপ দুর্ঘটনা হিন্দু বিবাহে অতি স্বাভাবিক। পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরির জন্যে যেখানে স্বাস্থ্যের পরীক্ষা দিতে হয়—বুকের ছাতির মাপ লাগে—লম্বা চওড়া এমন কি বাইসেপের মাপ পর্য্যন্ত দরকার হয় অথচ এমনই মজা জীবনের সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার বিবাহে স্বাস্থ্যের কোন সার্টিফিকেট লাগে না। আমাদের দেশে যোগ্যতা বিবাহের আগে একবার বিচার হয়। এবং সেই যোগ্যতা শুধু বোঝায় তার চাকরি আর মাইনে দিয়ে। তা না হ'লে সে যে পুরুষ এইটাই তার বড় সার্টিফিকেট।

বরং পাত্রীর বেলায় যোগ্যতার বিচার বেশী করেই করা হয়। পাত্রী

সাজা থেকে আরম্ভ ক'রে কাটলেট ভাজা, আধুনিক গান থেকে খেয়াল টপ্পা, অর্গান বাজনা থেকে বসন্ত-নৃত্য সবগুলিই যাচাই ক'রে দেখা হয়। বিবাহের সাতদিন পরে কিন্তু কোনটারই আর প্রয়োজন হয় না।

শুভদৃষ্টির শুভকার্য্যের পর পাঠকদের যদি ইচ্ছা থাকে একবার বাসর পর্য্যন্ত উঁকি দিয়ে আসতে পারেন। এখানে এখন কুমারী আর বিবাহিতাদের ভিড়ে দিশেহারা হবার সম্ভাবনাই বেশী। তবে ধৈর্য্য ধরে ঐ ফুলের বোকে দুটির পাশে যদি দৃষ্টিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারেন দেখবেন সৌন্দর্য্যের হাটে একচ্ছত্র নায়কের মত বরের আসন আর তার পাশে লজ্জানতমুখী হাসি-জড়ানো-ওষ্ঠা—ঐ কনে বৌ। আচ্ছা আজ আমরা বিদায় নিই আসুন। সমাজের মহিলারা তাদের মিলন ব্যাপারের প্রথম পর্ব্ব নিজেরাই সম্পন্ন করুন—মুচলেখা লেখাবার কাজে আমাদের থেকে ওঁদের হাতই বেশী পাকা। বাসরে তাই ওঁদের বেশী প্রয়োজন।

কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বাসরের জয়গান করা যাক্।

হায়রে বাসর ঘর.........
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।

ক্লান্ত বাড়ী, অতিথি অভ্যাগতরা সব চলে গেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কলাপাতা আর মাটির গ্লাস ভূরিভোজের সাক্ষী হ'য়ে পড়ে আছে। কনেও বরের সহগমন করেছে তার বাড়ীতে। চলুন আমরাও পিছু নিই সেখানে।

সাবধান একটু সঙ্গোপনে থাকতে হবে কিন্তু, ওদের লজ্জা এখন বেশী।

মদন ফুলকে যেমন বেছে নিয়েছে তার শরসন্ধানের জন্যে, শয্যাকেও ওরা সাজিয়েছে ফুলে। ওঃ আজ যে ফুলশয্যা! বাহিরের উৎসব শেষ হ'তে বেশ রাত্রিই হ'ল, তারপর আগন্তুকদের বধূদর্শন করান হ'ল।

দর্শনীও মিললো প্রচুর—বধুর ননদ তার হিসাব রেখেছে। রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে বাড়ীও নির্জ্জন হ'য়ে এল, ঐ বুঝি বরবধূ প্রবেশ করলো ঘরে? এইবার চলুন ওদের নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে আমরা চলি।

আপনাদের ইচ্ছে নয় দেখছি, ছিঃ লুকিয়ে আরও দেখতে হবে? কিন্তু ঐ দেখুন বুড়ী দিদিমা আর পাড়ার আরও দুটি মেয়ে, বৌদি এরাও পা টিপে অন্ধকারে অন্ধকারে আসছে জানলার কাছে—আড়ি পাতবে বোধ হয়!

দুজনেই ওরা আজ অত্যন্ত ক্লান্ত—এখুনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু বিছানায় যে ফুলের রাশি—যুঁইএর যে মাতাল গন্ধ...মেয়েটি অপরিচিতার মত খাটের প্রান্তে বসে কেন? যাও বর, যাকে জয় ক'রে ঘরে এনেছ তার মূল্য বোঝবার চেষ্টা কর। তাইত, আমার কথা শুনতে পেল নাকি? জামা ছেড়ে সত্যিই উঠে গেল ছেলেটি—সামনে দাঁড়ালো তার—ধীরে তার চিবুকটি ধরে মুখখানি সোজা ক'রে তুলে ধরলো।

কী যে লজ্জা তোমার নতুন বৌ? তুমি মুখটি ফিরিয়ে নিলে আবার? ছেলেটিও দুষ্টু কম নয়, মাথার আঁচলটা সে খুলে দিলে কেন? এবার বুঝি কনে বৌ সত্যিই বিরক্ত হয়।

কিন্তু কই, মুখ নীচু ক'রে সে যে ঠোঁট দুটি টিপে হাসছে। ছেলেটির এবার দুঃসাহস বলতে হবে—রীতিমত পাশে তার বসলো সে খাটের ধারে—তারপর একখানি হাত দিয়ে কনে বৌকে সে বেষ্টন করলো।

নরম মিষ্টি সুরে কী যেন কথা হ'ল দুজনে—অনেকদিন আগের যেন চেনা জানা—চন্দ্রগ্রহে তাদের যেন কবে দেখা হয়েছিল মনে হচ্ছে; তাই সূর্য্যের আলোর মত স্পষ্টতা নেই সেথা।

দুজনের মুখ এখন বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। লজ্জা তা'হলে কাটলো তোমার কনে বৌ? তাই ত' দেখি, দুজনের ঠোঁঠদুটি যে মিলে—এই বুঝি তোমাদের যাত্রা সূচনার মঙ্গল-তিলক!



ঝড় এলো

মানুষ তার জীবনের যে সময়টিতে সর্ব্ববিষয়ে বিকশিত হবার যোগ্যতা লাভ করে বিবাহ সাধারণতঃ সেই বয়সেই হয়। দেহের ও মনের পূর্ণতা আসে। কর্ম্মক্ষমতা বেড়ে যায় সহস্রগুণে, আশা ও আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসে নেশার মত—এ সেই বয়েস। জীবনে উন্নতির সেই শুভ মুহূর্ত্ত—যে মুহূর্ত্তে দুঃসাহস তাকে গ্রাস করে—ভয় পাবার সব জিনিষকেই তখন সে 'ড্যাম কেয়ার' করে চলবার স্পর্দ্ধা করে। ভালবাসার অরুণোদয় হয় ঠিক এই শুভ লগ্নে।

সঙ্গী ও সাথীর প্রয়োজন হয় যৌবনের এই উদ্দাম মুহূর্ত্তে। বন্ধু বান্ধব মেলামেশার সমাজ চায় সে শুধু খেলাধূলার জন্যে নয়—নিজেকে ছড়িয়ে দেবার উন্মত্ততায়। শরীরের গঠন ও সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। ছেলে মেয়ে যত অসুন্দরই হোক যৌবন তাদের আরও সুন্দর ক'রে তোলে। প্রকৃতি দেবী এই শুভ সুযোগে তাদের শরীরের গোপন অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্ত্তন এনে দেন। কোনও গ্রন্থি এই সময় থেকে তাদের রসক্ষারণ আরম্ভ করে। এই থেকেই যৌন জীবনের সূত্রপাত।


ড্যাম কেয়ার করে চলে

নারী এখন আর পুরুষের কাছে শুধু রহস্যময়ী থাকে না—দৈহিক প্রয়োজনে তাকে দরকার হয়। নারীর প্রয়োজনকে ভিত্তি ক'রে মনের কল্পলোকে প্রেম বা প্রণয়ের সৌধ গড়ে ওঠে। আকাশচুম্বী ওঠে তার চূড়া, তোরণে তোরণে তার রঙীন আলো। ভালবাসা যৌবনের কল্পনাবিলাস নয়—যৌবনের ধর্ম্ম।

যৌবনের এই বিকাশোন্মুখ মুহূর্ত্তে নারীসঙ্গের ছাড়পত্র দেওয়াই বিবাহ। সমাজ ও অভিভাবক বিবাহের মধ্যে দিয়ে যৌন ক্রিয়ার অবাধ অধিকার দিয়ে দেন। একদিকে যেমন স্বাধীনতা আবার অন্যদিকে যথেচ্ছ নারীসঙ্গ করবার স্বাধীনতার সঙ্কোচ আছে এর মধ্যে। একটি নারী ও একটি পুরুষ স্বামী স্ত্রীরূপে সারাজীবন চুক্তিবদ্ধ থাকবে এমনি আইন কানুন তৈরী আছে। স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীর



কর্ত্তব্য বেঁধে দেওয়া আছে

কর্ত্তব্য বেঁধে দেওয়া আছে—আনন্দে না হোক দুঃখেও তাদের সেই কর্ত্তব্য মেনে চলতে হবে—এমনি বাধ্যবাধকতাই বিবাহ চায়।

কর্ত্তব্য জীবনে বড় জিনিষ কিন্তু কর্ত্তব্যের মধ্যে যদি আনন্দ থাকে তাতে জীবন আরও ধন্য হয়। সমাজ বা ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট বিধি বিধানটাই শুধু জীবনের চেয়ে বড় নয় আজ আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি। তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধুমাত্র কর্ত্তব্যের অনুশাসন জীবনের পথ মসৃণ করে না। আনন্দ যেথায় নেই কর্ত্তব্য সেথা জবরদস্তি মাত্র। আনন্দের অভিষেক ভালবাসায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের পথে তাই ভালবাসার কুসুম ছড়ানো চাই।

এইখানে আবার একটি জটিল প্রশ্ন আসে ভালবাসা কথা নিয়ে। আপাততঃ আমরা এই কথাটির জটিলতা থেকে দূরেই থাকবো। স্বামী-স্ত্রীর সংসারযাত্রার পথে নিরন্তর দেখেছি অশান্তির দাবানল জ্বলছে। যেখানে আনন্দের শতদল ফুটতে পারতো সেথা মরুভূর মত হাহাকার বাস করছে। প্রতি মুহূর্ত্তে পরস্পরে মনে করছে যে তাদের দুজনকে যেন বেঁধে দেওয়া হয়েছে এমন এক গ্রন্থিতে যা আর খুলবে না—অচ্ছেন্ত ও আমরণ। এক মৃত্যু ছাড়া তা কেউ খুলতে পারবে না।



এমন বাঁধন যা আর খুলবে না

বাধ্যতামূলক ব্যাপারে মানুষের মন হাঁপিয়ে ওঠে। বন্ধন তখন যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু আনে না। যে বন্ধনকে একদিন সবচেয়ে কাম্য মনে হয়েছিল সেই বন্ধন গলার ফাঁসের মতই মনে হয়। কিন্তু যখনই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধকে বন্ধন বলে মনে হচ্ছে তখনই বুঝতে হবে কোথাও কোন অদৃশ্য গলদ লুকিয়ে আছে।

দাম্পত্য জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যে মাদকতা থাকে তার জের

বেশীদিন চলে না। দেহের সঙ্গে দেহের পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হ'তে থাকে তখন অন্তরের অন্ত বৃত্তিগুলি দেহলালসার কঠিন আবরণের মধ্যে আত্মস্থ থাকে। একজনের দেহ তখন আরেক জনের কাছে রহস্যময়। রহস্যের মেঘ কেটে যায় যখন যৌনবৃত্তিগুলি আস্তে আস্তে তৃপ্তির পথে চলে। তখন মনের অন্যান্য নানাবৃত্তিগুলি তৃপ্তি খুঁজতে চায় মনের সঙ্গে মিশে।



একজন আরেকজনের কাছে রহস্যময়

পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মিঃ ও মিসেস সেনের দাম্পত্য জীবন। তৃতীয় বছরেই তারা পরস্পরের কাছে যেন আকর্ষণের রোমাঞ্চটুকু হারিয়ে ফেললো।

স্বামী-স্ত্রীকে নানা প্রয়োজনে থাকতে হয় অত্যন্ত কাছাকাছি—অহর্নিশ তাদের এক প্রকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য! ভুল ক'রে অত্যন্ত ঘেঁষা-ঘেঁষিই বাস করে তারা। তাই সহজেই পুরাণো হ'য়ে পড়ে দুজনে দুজনের কাছে। কিম্বা একজন আরেকজনের কাছে নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। এই অশুভলগ্নেই বিষবৃক্ষ ওঠে গজিয়ে সংসারের সমস্ত আকাশ ধূমাচ্ছন্ন ক'রে।

স্বার্থপরতা এই বিষবৃক্ষের এক শিকড় এবং আর একটি শিকড় সহ্যশক্তির অভাব।

বড় হওয়ার সঙ্গে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ গ'ড়ে ওঠে। স্বভাবের নিয়মেই আমরা আপনার দিকটা বুঝতে শিখি কিন্তু ছোটবেলা থেকে শিক্ষার গুণে বা দোষে এই স্বার্থবোধের তারতম্য দেখা যায়। উগ্র স্বার্থপর লোক কোনদিন কারুর সঙ্গে মিশতে পারেনা আবার স্বার্থ সম্বন্ধে যে উগ্ররকম সচেতন নয় সে

অনেকের সঙ্গেই মিশতে পারে এবং সে মেশা বাইরের দিক থেকে যতখানি সত্য ভিতরের দিক থেকেও ততখানি গভীর। বেশ খোলা মেলা ভাবেই তারা মেশে।

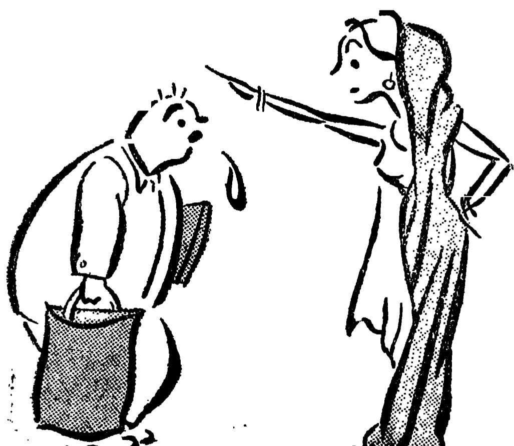
ছোটবেলা থেকেই স্বার্থ সচেতনতার দিকে লক্ষ্য রেখে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করা দরকার। বংশানুক্রমেও এই প্রকৃতি সঞ্চারিত হয়। স্বামী বা স্ত্রী নিজনিজ স্বার্থ সম্বন্ধে বেশী সচেতন হলেই দাম্পত্যজীবনে গণ্ডগোল বাধে। অবশ্য এমনও দেখা যায় এই প্রকৃতির স্বামী স্ত্রীকে নিজ অধিকারের সম্পত্তি হিসাবে ধ'রে নিয়ে বেশ সুখে কাটিয়ে যান। হয়ত স্ত্রীও নিজেকে স্বামীর সম্পত্তিরূপে ধ'রে নিয়েও কোনও অস্বস্তি বোধ করেন না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর পৃথক স্বার্থবোধ থেকে তাদের সম্বন্ধ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় এবং ভালবাসা যায় কর্পূরের মত উবে।

দাম্পত্যজীবনে নিজের ষোল আনা বলে কিছুই থাকা উচিত নয়। বিবাহের চুক্তির মধ্যেই দেখা যায় স্বামী বা স্ত্রী দুজনের পৃথক সত্তা অন্ততঃ বাড়ীতে কিছুই থাকা উচিত না। সুতরাং একজন যদি সুখ সুবিধা বা আরামের ষোল আনাই দাবী করে তা হ'লে আরেকজনকে তা জোগাতে হবে এবং ফলে তাকে অসন্তুষ্ট থাকতে হবে। একদিন-দুদিনে না হোক বহুদিন পরেও এই অসন্তোষ দেখা দিতে পারে বিরাট অশান্তি হয়ে।



যথেষ্ট ভৎর্সনা শুনতে হয়

এমন অবিবেচক স্বামী আছে যে স্ত্রীকে সংসারের নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখেও হুকুম করতে দ্বিধা করে না এবং হয়ত গরম জল দিতে দু' মিনিট দেরী হওয়াতে বা জলের উত্তাপ সামান্য কম বেশী হওয়াতে স্ত্রীকে যথেষ্ট ভৎর্সনা শুনতে হয়।



জ্বালাময়ী এক বক্তৃতার পর

আবার এমনও হয় সারাদিনের কর্ম্মশ্রান্ত অফিস প্রত্যাগত স্বামী বাড়ীতে ঢুকতেই আবিষ্কার করলো যেন সে কি অন্যায় করেছে। তারপর স্ত্রীর জ্বালাময়ী এক বক্তৃতা শোনার পর তদ্দণ্ডেই তাকে বাজারে গিয়ে স্ত্রীর জর্দ্দা এনে দিতে হয়েছে।

সহ্যশক্তির অভাব আর একটি দোষ যার জন্যে কত সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একজনের কাছে অন্যের কথা বা আচরণ যদি অপ্রিয় হয় তখনই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং কর্কশভাবে জানিয়ে দেয় সে যা চায়। কিন্তু তা হয় না—জোর ক'রে দাবী করতে গেলেই ভুল করা হবে। আমাদের দেশে সহ্যশক্তিকে অনেক বড় করা হয়েছে। 'তরোরপি সহিষ্ণুণা' বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথা। মেয়েরা মেয়েদের যে শিক্ষাটি বেশী ক'রে দেয় সেটা হচ্ছে সহ্য করবার শিক্ষা। শিক্ষিতা ও প্রগতিশীলারা এর মধ্যে আত্ম-অবমাননার গন্ধ পেয়ে দোষ দেয় এবং সহ্য করাকে এক প্রকার দুর্ব্বলতা ব'লে 'অবলা'দের উপহাস করে। কিন্তু এদেরই গার্হ্যস্থ জীবনের চৌকাটে যদি কোনদিন পা দেন, দেখবেন রবিবার স্বামী ইজিচেয়ারে একখানা বিলিতি নভেল পড়ছে,

স্ত্রী পিছন ফিরে একটা গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছে। রাগে দুজনেই গুমোট—কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন, হয়ত শুনবেন—স্বামী স্ত্রীকে কোনও পার্টিতে যোগ দিতে 'না' করায় স্ত্রী রাগে একটি দামী টি-সেট চুরমার করেছে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় স্বামী দেবতা স্ত্রীর আলমারীর বাহারে পুতুলগুলি আস্ত রাখেনি। তারপর আপনি যা দেখেছেন—তুষ্ণীভাব। কীটদষ্ট পল্লবের মত গার্হ্যস্থজীবন স্বাস্থ্য হারিয়ে শ্রীহীন হ'য়ে পড়ে।

সহ্য শক্তির অভাবের সঙ্গে আর একটি দুষ্টক্ষত জন্মায় সেটি হচ্ছে জিদ বজায় রাখার চেষ্টা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেউই ছোট হ'তে চায় না, প্রত্যেকেই আপন জিদ কোনমতে ছাড়তে নারাজ। কিন্তু ফলে কি সর্ব্বনাশকে যে ডেকে আনা হয় তা বোঝে না। একটি সত্য ঘটনার কথাই বলি। স্ত্রীর একটি সামান্য সিনেমা দেখার ইচ্ছা স্বামীর তরফ থেকে কোনও কারণে বাধা পেয়ে জিদে পরিণত হয়। স্বামীরও জিদ সমান ভাবে বেড়ে গেছে—কেউই হার স্বীকার করতে রাজী নয়। পরিণামে স্ত্রী আত্মহত্যা ক'রে জিদ বজায় রেখেছে। এইভাবের না হ'লেও ছোট খাটো অনেক ঘটনা অনেক সংসারে নিত্যই ঘটে এবং দাম্পত্য জীবন তিক্ত হ'য়ে ওঠে।

মেয়েরা মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ হিংসা ও এক প্রকার ঘৃণা পোষণ করে। স্বার্থ সম্বন্ধে তখন তারা যেন বেশী সচেতন কিন্তু পুরুষের সম্বন্ধে তারা কতকটা উদার মনোভাবই রাখে মনে হয়। এদিক থেকে স্বামীগণের অনেকখানি নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত! কিন্তু নিশ্চিন্তই বা তারা হবে কি ক'রে? অন্য মেয়ে সম্বন্ধে তাদের নিজেদের অত্যধিক আগ্রহ স্ত্রীর কাছে ধরা পড়াও বিপদ আর অন্য পুরুষ সম্বন্ধেও যদি স্ত্রীর উদার মনোভাব থাকে তাও কম উৎকণ্ঠার দ্রব্য নয়!

অবশ্য কেউ যেন না মনে করেন যে স্বার্থ সচেতন স্বামী বা স্ত্রী হলেই তারা নীচ-মন হবে। তার মানে নেই। হয়ত বাইরে অন্য লোকের সঙ্গে ব্যবহারে তাদের মত উদার চরিত্র আর কাউকে দেখা যায় না।

কতকগুলি বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীরা মারাত্মক ভুল করে। মনে করুন

খরচপত্র বিষয়ে স্বামীর যদি অত্যন্ত হাত লম্বা হয় এবং বাজে খরচের দিকে ঝোঁক থাকে—সাধারণ স্ত্রীরা খরচ কামানোর জন্যে অনুনয় বিনয় থেকে সুরু ক'রে শেষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফল তার উল্টো হয়। অধিকার বোধের চেতনা থেকে স্বামীও তার গোঁ বজায় রাখবার চেষ্টা করবেই। এ রকম স্থলে স্ত্রীর হয়তো উচিত নিজের হাত লম্বা করা, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেও কম না যায়—এইভাবে চলতে থাকলে অপর তরফ থেকে সঙ্কোচনের প্রস্তাব আসবেই এবং আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

বিবাহজীবন অনেকের মতে একটা খেলার মত যাতে দুটি মাত্র পক্ষ বা পার্টি যোগ দেবে। একা বা তিনজন নিয়ে এ খেলা চলতে পারে না। দুজনকে তাই মনের দিক থেকে খাঁটি হ'তে হবে। সত্যকার চিন্তা ভাবনা ও আবেগগুলির সহিত পরস্পরের পরিচয় থাকা উচিত। কোন সমস্যা একজন যেন অপরের কাছ থেকে লুকিয়ে না রাখে। লুকোচুরি মারাত্মক বৈকি! একজন একটা লুকোলে অপর পক্ষও সেই নীতি গ্রহণ করবে। তখন প্রত্যেকের ভিতরে থাকবে তার নিজের জগৎ। বাইরে তারা একটা মুখোস নিয়ে মিশবে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তা খসে যেতে পারে।



লুকোচুরি মারাত্মক বৈকি

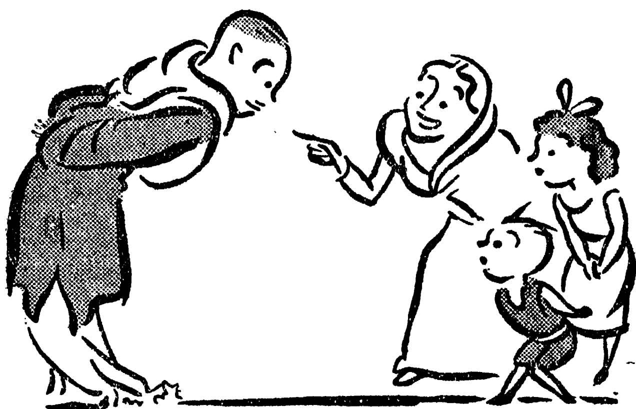
কোনও সময় কারুর ভুল হ'লে তা স্বীকার করার সাহস স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যেমন বেশী দরকার এমন আর কোথাও নয়। নিজের দোষকে দোষ বলে স্ত্রীর কাছে বা স্বামীর কাছে স্বীকার করায় অপমান বা ছোট

হওয়ার কি থাকতে পারে? নিজেদের জিদের বশে এইটাই আমরা চিরকাল ভুল করি এবং তার মূল্যও দিতে হয় প্রচুর। সরল ভাবে একে অপরের কাছে নিজের ত্রুটি স্বীকার করলে অনেক সময় অনেক অশান্তি ও অনর্থের হাত থেকে বাঁচা যায়।

একটা আগুনের ফুল্‌কি গোড়াতে নেভানো সহজ এবং বুদ্ধির কাজ নয় কি?

স্বামী যেন প্রেমের মধুর আদর অত্যাচারগুলি বাড়ীতেই অভ্যাস করে। দাম্পত্যের মধ্যেই যেন তা সীমাবদ্ধ থাকে। সুখ ও শান্তির নীড় হবে গৃহ। গৃহকে কেন্দ্র ক'রেই যেন তাদের আনন্দের মুহূর্ত্তগুলি ঘুরে বেড়ায়। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ে এবং বাইরে আনন্দ সন্ধান করতে থাকে। একপক্ষের এই বহির্মুখী অভিসার একেবারে খারাপ ফল এনে দেয়। ঘর তখন সয়তানের কারখানা হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বাইরের নির্দোষ আমোদ প্রমোদ দাম্পত্য-জীবনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। ধরুন স্বামীর ক্লাবে যাওয়া, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেশা, নির্দোষ খেলাধূলা—টেনিস বা ফুটবল, তাস পাশা বা দাবা এই রকম খেলা বা খেলোয়াড়দের সাহচর্য্য মনকে নির্ম্মল



পিতাকে চিনিয়ে দিতে হয়

করে। মেয়েদের পক্ষে তেমনি সঙ্গী সাথীর সঙ্গে গল্পগুজব সূচীশিল্প বা সময় কাটানোর জন্যে কোন শিল্প ও খেলা অভ্যাস—এগুলিও দরকার।

অবশ্য এর চূড়ান্ত কোন ক্ষেত্রেই ভাল নয়—যেমন স্বামী অত্যন্ত ক্লাব ভক্ত হয়ে বাড়ীতে এমনই বিরল হয়ে পড়ে যে স্ত্রীকে ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের পিতাকে চিনিয়ে দিতে হয়। সময়ে সময়ে বা স্বামী সিনেমায়, ক্লাবে বা পার্কে কোন তন্বী আধুনিকা সদ্য-আলাপিতার সঙ্গে মিশে মোহজর্জ্জর হ'য়ে বাড়ী ফেরে। তারপর আবার সিনেমায় যাবার নতুন 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে হয় তাকে। দু'ইএর মধ্যে এই তৃতীয়ের আবির্ভাবে অনেক দিনের শান্তি নষ্ট হ'য়ে দাম্পত্যজীবন লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যেতে পারে।



অ্যাপয়েণ্ট-মেণ্ট রাখতে হয়

নরনারী সম্পর্কে এই ত্রিভুজনীতি সব সময়ই মারাত্মক। নগেন্দ্রনাথ, কুন্দের মত কিম্বা গোবিন্দলাল, রোহিণী আর ভ্রমরের মত সাহিত্যে এর নজিরের অভাব নেই।

পুরুষ অন্য মেয়ের সঙ্গে মিশতে চায় অবাধে, এটা সে দোষ মনে করে না। বহুপত্নীত্বে বা বহুপ্রেয়সীত্বে যেন তার জন্মগত অধিকার। স্ত্রীলোকের বেলায়ও একথা খাটে না কেন জানি না—বহুবল্লভত্বও ত তার সমান কাম্য হ'তে পারে! কিন্তু পুরুষ তা কখনও সহ্য করে না। আরব্য উপন্যাসের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় এই অপরাধে মেয়েদের কি নিষ্ঠুর অত্যাচারই না সহ্য করতে হয়েছে! একজনের কাছে যদি কোন জিনিষ নিষিদ্ধ হয় তার প্রণয়ীর কাছে তা নিষিদ্ধ হবে না কেন? বিবাহের চুক্তিতে তা নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। কেন না

পরস্পরের অনেকখানি স্বার্থ-বর্জ্জনের ভিত্তির ওপরেই বিবাহের পবিত্র চুক্তি-পত্র তৈরী। শুধু তাই নয় এর সঙ্গে সমাজ সম্পর্কিত প্রজনন সমস্যাও অনেকখানি জড়িত আছে।

আমাদের দেশের মেয়েরা স্বভাবগুণে বা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের গুণে অনেকখানি স্বার্থবর্জ্জনে প্রস্তুত থাকলেও পুরুষ নিজেদের বেলায় এ-নীতি মানতে রাজী হয় না। সে তার পুরুষ-সুলভ সুবিধাগুলি ভাঙ্গিয়ে স্ত্রীর ওপর টেক্কা মারবার চেষ্টা করে। নিজের একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেমের অনেক কথাই তাকে বানিয়ে বলতে হয় কিন্তু একটা মস্ত কালো মেঘ গজাতে থাকে দুজনের মধ্যে। স্বামীকে ধরার কোন ক্ষমতা বা তাকে ফেরানোর কোন কর্ত্তৃত্ব অনেক স্ত্রীর হাতেই থাকে না তাই তাকে সন্দেহজর্জ্জর হয়ে গুমরে থাকতে হয়। কিন্তু সন্দিগ্ধ স্বামীরা সময় সময় যেমন হিংস্র হয় তেমনি হাস্যকরও হয়ে পড়ে।


ধরার বাইরে চলে যায়

অনেক স্বামী আছে স্ত্রীকে সত্যিই তারা ভালবাসে এবং সে এমন সর্ব্বগ্রাসীভাবে যে, স্ত্রীর যে কোন প্রিয়জনকে সে ঈর্ষা করে হিংসা করে। একটি গোলাপকে স্ত্রী সুন্দর ব'লে আদর ক'রে কবরীতে গুঁজে রাখলো—মাত্র এই দৃশ্য চোখের সামনে দেখে তার স্বামীদেবতা ফুলগাছটাই কেটে ফেললো এ রকম কাহিনীও শোনা গেছে।

স্ত্রীর সতীত্বে সন্দিহান স্বামীদেরও কত কাহিনী আছে। পুরাকালেও

এ ছিল। স্ত্রীর কোমরে সতীত্ব রক্ষার ধর্ম্ম আটকে স্বামীরা বিদেশে যেত। আরও কত অমানুষিক উপায় ছিল যে তা বলা যায় না। এখনও দেখা যায় স্ত্রীকে চাবি-তালায় রাখার ব্যবস্থা করতেও স্বামীরা লজ্জা পায় না। স্ত্রী কোথাও গেলে গোপনে তার পাছু নেওয়া এমন কি স্ত্রীর বাপের বাড়ী থেকে তাকে উদ্ধার করে গভীর রাত্রে পদব্রজে বাড়ী ফেরা কোন



পাছু লওয়া দোষের নয়

প্রেমিক স্বামীর পক্ষে অসম্ভব নয়। এগুলি অত্যন্ত গভীর প্রেমের লক্ষণ হতে পারে—'চোখের আড়াল' সহ্য হয় না কিম্বা 'সদা চোখে চোখে রাখি' এই ভাব এর মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু বেশীক্ষেত্রেই একটা জঘন্য সন্দেহই এই অস্বস্তির কারণ বলতে হবে।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে হয়ত স্বামীর সন্দেহ অমূলক নাও হ'তে পারে। 'গোপন পিরীতির' নিষিদ্ধ ফল ঈভের বংশধরদের সবার কাছেই যে অনাস্বাদিত তা বলা যায় না। একটা গল্প শুনুন—এক ভদ্রলোক অফিসের হেডক্লার্ক—বয়েস খুব কম নয়, চুলে সবে মাত্র পাক ধরেছে, ঘরে কিন্তু তরুণী ভার্য্যা। ভদ্রলোকের একটু ঐ রকম মুদ্রাদোষ ছিল। একদিন অসময়ে বাড়ী ফিরলেন—ত্বরিৎপদে ভার্য্যাকে হাতেনাতে ধরবেন এই তাঁর মতলব! ঘরে ঢুকে দেখেন স্ত্রী একা দরজার দিকে পিছন ফিরে বই পড়ছে। দেখে আশ্বস্ত হলেন কিন্তু



তুমি কি দুষ্টু সমীর ?

চোরের মত পা টিপে টিপে এগুলেন—আনন্দে তাঁর সর্ব্বশরীর কাঁপছে—রহস্য করবার উদ্দেশ্যে পিছন থেকে চোখদুটি চেপে ধরলেন। স্ত্রী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বলে উঠলো—তুমি কি দুষ্টু সমীর ?
ভদ্রলোকের নাম ছিল কিন্তু বিশ্বম্ভর রায়।



বউ, কথা কও—

অনেক কিছু সমস্যামূলক প্রশ্নের মত প্রশ্ন হচ্ছে—আদর্শ স্বামী কেমন হবে—আদর্শ স্ত্রী কেমন হবে?

আদর্শ স্বামী-স্ত্রী কেমন হবে তার কিছু আভাষ দেওয়া হয়ত সম্ভব কিন্তু পৃথকভাবে স্বামীর বা স্ত্রীর আদর্শ হবার মাপকাঠি কে বাৎলাবে? প্রত্যেক স্বামীর কল্পনায় তার স্ত্রীর একটা আদর্শ রূপ লুকিয়ে থাকে। প্রত্যেক স্ত্রীর মনেও অনুরূপ একটি আদর্শ স্বামীর ছবি আঁকা থাকে। বাস্তবের সঙ্গে এই কল্পনার চিত্রগুলির প্রতিনিয়ত গরমিল হয়।

'যাহা পাই তাহা চাই না......'ধরণের ঘটনাই ঘটে বেশী। কল্পনা ও বাস্তবে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। যা পাওয়া যায় তাকে বাস্তবের সত্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত—কল্পনার রঙীন্ ফানুস্ অনেক দূরে উড়িয়ে নিয়ে যায় কিন্তু ফেঁসে সে যাবেই এবং তখন কঠিন মাটিতে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না।

বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কনের মনের রঙমহলে কল্পনার কত কি স্বপ্ন থাকে! বাস্তব বিবাহে ক'টাই বা তার মিলে যায়। যেটুকু মিল্‌লো তাকে ভাগ্য বল্‌তে হবে, যা মিললো না তা নিয়ে ভেঙ্গে পড়বার কোন কারণ নেই। বিবাহ দোকানে ঠিক জিনিষ কেনা নয় যে পছন্দমত একশোবার বদলে নেওয়া যায়। ভাগ্য-বিশ্বাসী বা 'ফেটালিষ্ট' হওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে আর উপায় নেই। অথচ স্বপ্নপ্রবণ তরুণ মনের কানে কানে হিসাবের এ বাণী শোনাবে কে?

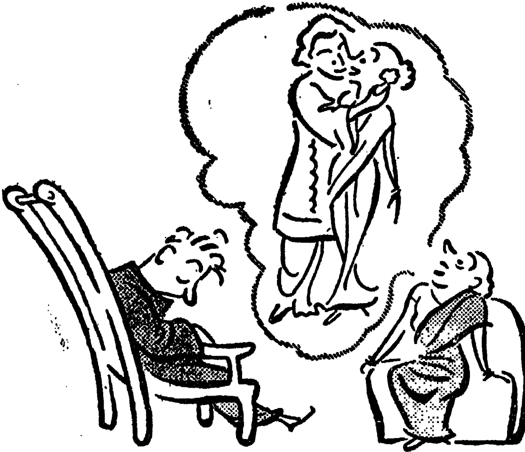
আসুন আমরা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত দম্পতির ঘরে একবার প্রবেশ করি। বিবাহিত জীবনের প্রথম অঙ্কে নিশ্চয়ই তারা আনন্দে মশগুল্ হ'য়ে আছে। আচ্ছা ধীরে ধীরে আসুন—কোন ক্রমে ওদের জানতে দেওয়া হবে না যে, আমরা তাদের কাছে এসেছি।

ঐযে দেখা যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী এক ঘরেই আছে। কিন্তু, একি? কেউ কথা বলছে না। সতীশ একটা সোফায় বসে, রাণী কিছু দূরে সেলাই না কি একটা কাজে ব্যস্ত। সে সত্যিই একমনে কাজ করছে! তার-ছেঁড়া সেতারের মত অবস্থা! স্বামীর মনের ছবিটি


এস এস সুন্দরী শুকতারা!

ভাল ক'রে দেখুন, বেচারা এখনও স্বপ্নজগতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কল্পনার মানসী, কাব্যের প্রেয়সী কী মোহনীয় বেশে তার অন্তরাকাশ আলো ক'রে আছে। সিনেমার পর্দায় যে মোহিনী নারীকে সে দেখেছে, কাব্যে সাহিত্যে যে মানস প্রতিমার ছোঁওয়া সে পেয়েছে তারই মিশ্রিত রূপ ঢালাই ক'রে প্রেয়সীরূপে চায় সে! স্ত্রীর আসনে সে যদি বসতো আজ!

আবার স্বামী যেদিন কর্ম্মক্লান্ত হ'য়ে বাড়ী ফেরে—বাইরের জগতের নানা চিন্তায় সে কাতর—শয্যায় সে এলিয়ে দিল নিজেকে, স্ত্রীর ওপর অবিচারই সে করলো—অধরসুধা পান করতে রীতিমতোভাবেই ভুলে গেল। এমন কি আলাপ করার কথাও তার মনে এল না। স্ত্রী সেদিন সেই মুহূর্ত্তে অভিমান-ক্ষুব্ধা হয়েছিল—স্বপ্ন ছবির মত দেখলো সে তার বহুদিনের কল্পনার আঁকা মানসপ্রিয় অপরূপ রাজকুমার সোণালি আলো বেয়ে তার ঘরে এসেছে—অগাধ ঐশ্বর্য্য তার, প্রেমের স্বপ্ন তার চোখে, হাতে এক গুচ্ছ করবী—এলিয়ে দিল সে নিজেকে রাজকুমারের বুকে—রাজকুমার ফুলগুলি তার অলকে গুঁজে দিল—ধীরে ধীরে বললো, আকাশ যেমন আজ ঐ সমুদ্দুরে মিশেছে তোমার আমার মিলন তেমনি—বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা তফাৎ থাকতে পারিনা......



তোমারই তরে হিয়া উঠিছে মুঞ্জরিয়া

ভুল করছো রাণী! ভুল করছো সতীশ! স্বপ্ন মেলেনা বাস্তবের

সঙ্গে। স্বপ্ন সে স্বপ্নই। মাটীতে তাকে টেনে নামানো যায় না। যা পেয়েছো তার সঙ্গে করতে হবে আপোষ। বাস্তবের সুখের পিছনে অক্লান্ত চেষ্টা দরকার—শান্তি পেতে হ'লে তার উপযোগী ক'রে নিতে হবে নিজেদের তার জন্যেও সাধনা দরকার। কোন আনন্দই বিনা সাধনায় আসে না। এই যে তোমরা পারছো না বাস্তবকে মেনে নিতে, এতে দুঃখ পাচ্ছে কে ? তোমাদের মুখ দেখলেই তা স্পষ্ট হয়।

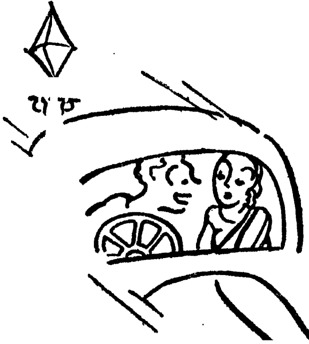
আর তোমাদের স্বপ্নের দুর্লভকেই যদি তোমরা পেতে তাহ'লেও একদিন তোমাদের এই অবস্থা হ'ত।

ছোটখাটো আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোট বড় আদান প্রদানের ভঙ্গীগুলি মার্জ্জিত হওয়া দরকার। ভদ্র ও সম্ভ্রমসূচক ব্যবহারগুলির বিনিময়ে শুধু সেই রকম ব্যবহারই পাওয়া যায়। কথায় বলে যেন আয়নায় মুখ দেখা। নিয়ম মত এই মার্জ্জিত অভ্যাসের চর্চ্চা করতে হয়। মন বা ইচ্ছা না থাকলেও অভ্যাস মত এগুলি পালন করা উচিত। স্ত্রী যখন ধূমায়িত একটি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে স্বামীর উদ্দেশে নিবেদন করে তখন স্ত্রীকে একটা ধন্যবাদ দিতে কোনও স্বামীর দ্বিধা করা উচিত নয়। কিন্তু এইটুকু সৌজন্যের অভাবই আমাদের জীবনে বেশী ঘটে না কি ?


একটা ধন্যবাদ দেওয়া আর এমন কি ?

একজন স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়কে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চিঠি লিখেই না তবে উত্তর পাবার আশা করা যায়। না লিখে উত্তর পাওয়া অবশ্য ভাগ্যবশেই ঘটে বলতে হবে। তারপর চিঠির যেমন সুর যেমন ছন্দ, উত্তরও আসে সেই সুরে সেই ছন্দে। প্রেমের ব্যাপারে বেশীর ভাগ তাই যতটুকু দেওয়া যায় পাওয়া যায় প্রায় ততটুকুই। অবশ্য কাব্যে এর অতিরঞ্জন আছে।

মেয়েরা চায় পুরুষ তাদের দিকে সব সময়েই যেন মন দেয়! উদাসীনতা তারা সহ্য করবে না। মান অভিমান তারা করবে কিন্তু অপর পক্ষের অভিমান তারা সইবে না। তারা সূক্ষ্ম জিনিষের বিশেষ পক্ষপাতী নয়—যা ধরা ছোঁওয়া যায় না তা নিয়ে তারা কমই মাথা ঘামায়। তার চেয়ে যা স্পষ্ট, যা ধরা ছোঁওয়া যায় তার সঙ্গেই তাদের বেশী কারবার। ধরুন, একটি মেয়ের ছুটি প্রেমপ্রার্থী আছে। একজন তার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছে—নীরবে সব রকম ত্যাগ ক'রে যাচ্ছে—মনে প্রাণে খাঁটি কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ কম। কথায় ব্যবহারে সে ফুটিয়ে তোলে না কিছুই—তার প্রেম-সাধনা ফল্গুর মত অন্তঃশীলা। অপরটি ঠিক বিপরীত, ভিতরে তার যা বাইরে প্রকাশ তার দশগুণ। প্রতিদিনই সে আসে মেয়েটির কাছে, আপনার প্রশংসা নিজেই করে শত মুখে, ভালবাসার কথা বলে যায় অজস্র, আসার সময় মার্কেট থেকে এক গোছা রজনীগন্ধা কোনদিন বা গোলাপ এনে নিয়মিতই উপহার দেয়—মোটারে ক'রে নিয়ে যায় তাকে বেড়াতে......বলুন দেখি, যদি মালা কারও গলায় দিতেই হয় কার গলার মেয়েটি দেবে?



নিয়মিত মোটরে নিয়ে যায়

সাধারণ মেয়ে শেষের ছেলেটিকেই যে বেছে নেবে তাতে সন্দেহ নেই। বাহ্যিক হোক কৃত্রিম হোক যা স্পষ্ট যা উচ্চারিত মেয়েরা তাকেই বরণ কর্ত্তে চায়—তাতে তার প্রথম প্রেমিকের জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তার জন্যে হয়ত সে নিজেকে দায়ী মনে করবে না। আদিম মানুষের দেবতা পূজা যেমন—মনের অগোচর সূক্ষ্ম সত্ত্বার পিছনে তারা ছুটতো না, তাদের দেবতা সূর্য্য, গাছ, পাথর......

এই থেকে স্বামীদের মনে রাখা উচিত স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের ধারা তাদের কেমন হবে। মনে মনে প্রিয়তমার আসনে স্ত্রীকে সব সময়

রাখা যদি শক্তই হয় প্রিয় সম্ভাষণ করতে আপত্তি কি থাকতে পারে ?

হলিউড বা টলিউডের উজ্জ্বল কোন তারকার সাথে স্ত্রীর রূপের তুলনা যদি নাই হয় তবুও তাকে সুন্দরী বলতে ক্ষতি কি ? রূপের প্রশংসাই না হয় করলো একটু। এই একটু প্রশংসার গর্ব্ব নিয়েই হয়ত আনন্দে আরও একটু সুন্দর দেখাবে তাকে। এই গর্ব্বের মধ্যে মেয়েদের আত্মতৃপ্তি।

চঞ্চল শিশুর মত মেয়েরা সাধারণতঃ বৈচিত্র্য চায়। তাদের কাছে স্বামীদের একঘেয়ে হয়ে যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়। নানারূপে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা দরকার। আদরের নানা ভঙ্গী, আলাপের নানা ভাষা প্রয়োগ করা দরকার। কিছু সময় প্রেম গুঞ্জরণ, কিছুটা আদর ভালবাসার কথা গুছিয়ে বলা এগুলো স্বভাবতঃ স্ত্রীদের ভাল লাগবে। সব জায়গায় আপনি বোবা হয়ে থাকুন ক্ষতি নেই কিন্তু স্ত্রীর কাছে আপনাকে মুখর হতে হবে। তর্কে নয় ঝগড়ায় নয়—মধুর আলাপে, প্রিয়ভাষণে। পুলকোচ্ছ্বাসে আপনি চুম্বন ত করবেনই—অকারণ পুলকেও করুন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝে মাঝে করুন না, ক্ষতি কি ?

প্রায়ই স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটা বিষয়ে তর্ক বাধে—কে বেশী ভালবাসে এই নিয়ে। সময়ে তুমুল ঝগড়াও বেধে গেছে এই প্রসঙ্গে। কেউই ছোট হবে না—কেউই স্বীকার করবে না তার ভালবাসার কোন ত্রুটি। বিলাতে একটি গল্প শোনা গিছলো—এই তর্ক নাকি মারামারিতে দাঁড়ায় এবং সে বরবধুর মধুময় 'হনিমুন' রাত্রিতেই।

স্ত্রীর কাছে গল্পের নায়কের মত পার্ট প্লে করা ভাল। যতটা রোমান্টিক হওয়া যায় ততই ভাল—প্রেমের ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস ভাল। কেননা যৌবনের চঞ্চল মুহূর্ত্ত ফুরিয়ে গেলেই ত আধা বয়েসে হিসেবী গন্ডময় হয়ে যেতে হবে। তখন ইট কাট পাথরের মত সংসারকে খতিয়ে চলার প্রবৃত্তি আসে। অবশ্য স্ত্রী সে বয়সেও অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং বার্দ্ধক্যে সেবা-পরায়ণা জননীর মতই হয়ে দাঁড়ায়।

নায়কের কথা বলতে পুলকিত সেনের কথা মনে পড়লো—সে ছিল একটু নাটুকে ধরণের ছেলে।

পুলকিত সেন যখন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে স্ত্রীর গললগ্ন হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, লতা তোমার চোখ দুটি দেখে কি মনে হচ্ছে জানো?

লতা কৌতুকের হাসি জড়িয়ে বলে—কি?

পুলকিত—মনে হচ্ছে যেন দুটি কালো দীঘি, স্বচ্ছ তার জল, তা দিয়ে অন্তস্তল অবধি দেখা যায়—না, অনন্ত নীলাকাশের মত স্থির আর প্রশান্ত, না তাও ঠিক হোলো না···মোট কথা এমন স্বপ্ন-জড়ানো চোখ আমি আর কখনও দেখিনি।

—রাত্তির হয়েছে কিনা, এত দেরী করে ত আগে কোনও দিন আসনি। লতা ঢুলতে ঢুলতে উত্তর ছায়।



শিকার কাহিনী অবিশ্বাস্ত হ'লেও চলবে

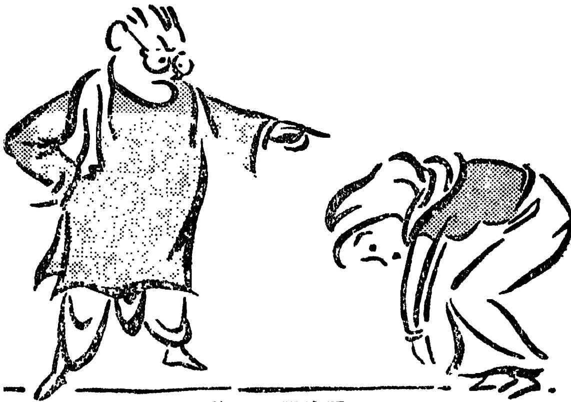
নিজের রোমাঞ্চকর কাহিনী স্ত্রীর কাছে গল্প করা ভাল। একাজ যে সকলেই করে তাতে সন্দেহ নেই এবং সে অতি-রঞ্জিত ক'রেই করে। স্ত্রীর কাছে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা নেবার কৌশলটুকু শেখা দরকার। অনেকে ভুল ক'রে শ্রদ্ধা দাবী করে দাবী করা শ্রদ্ধা বা প্রায়ই আন্তরিক হয় না।

পূর্ব্বেই বলেছি এগুলো পারম্পরিক ব্যাপার। স্ত্রীকে সর্ব্ববিষয়ে খুসী রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। তার ছোট খাটো ইচ্ছাগুলি পূরণ করা সব সময়ই ভাল ও আনন্দের বিষয়। অন্ততঃ সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটি যেন না হয়। যে স্বামী স্ত্রীর ছোটখাটো ফরমায়েজগুলি সরবরাহ করতে উদাসীন—আসার সময় রোজই হয়ত তার অর্ডার আনতে ভুলে

যায়—তার জন্যে স্ত্রী কেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করবে পদশব্দের সাড়া পেয়ে ?

স্ত্রীকে সব বিষয়ে খুশি যে রাখতে পারে তাকে খুশি রাখার জন্য স্ত্রীও ব্যস্ত থাকবে। অবশ্য আমি স্ত্রৈণ হ'তে কাউকে বলি না—সে অন্য জিনিষ—তখন স্বামীর নিজব্যক্তিত্ব লোপ পায়। আমি বলছি স্ত্রীর ন্যায্য ইচ্ছা ন্যায্য দাবী পূরণ করা ভাল যতদূর সম্ভব, কেন না এমন দাবী হয়ত থাকতে পারে যা স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে কিম্বা তা পূরণ করার দিকে স্বামীর ঘোরতর অনিচ্ছা। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে তা জানতে না দেওয়াই ভাল।

সময়ে সময়ে হয়ত স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধও প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু সে সময় খুবই সতর্ক থাকতে হয়। মান করার অধিকার নারীরই হয়ত বেশী তাই মানভঞ্জন প্রেমের ব্যাপারে একটি মধুর জিনিষ।



প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ

একজনের যখন মান হবে অন্যের তখন উচিত নিজেকে বিনীতভাবে নিবেদন করা। দুজনেই একই সাথে মানের পালা আরম্ভ করলে ভঞ্জনের ভার কে নেবে ?

প্রেমের ব্যাপারে রাগের চেয়ে অভিমানই হয় বেশী। অভিমান আসে রাগের ছদ্মবেশে। অভিমানকে রাগ বা বিরক্তি বলে ধরে নিলে মস্ত ভুল করা হবে। অভিমান প্রণয়েরই একটি অন্য জাতীয় রূপ। কানাই


তবু মন পায় না

মানিনী রাধার মানভঞ্জন করতে কত কাণ্ডই না করেছিলেন। শত কার্য্য ফেলে যমুনা তীরে তাঁকে হাজিরা দিতে হ'ত আর কুঞ্জে বাঁশী বাজাতে হ'ত। তরুণী ভার্য্যার মন রাখতে ও মানভঞ্জন করতে কত কাহিনীই ঘটে গেছে বৃদ্ধ স্বামীদের ইতিহাসে তা সকলেরই জানা আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সেই চলিত গান মনে পড়ে—

বাজার হুদ্ধা কিইন্যা আইন্যা
ঢাইল্যা দিনু পায়...

স্বামীদের কর্ম্মজীবন তাদের দাম্পত্যজীবনে অনেকখানি ছায়াপাত করে। পুরুষ তার পেশা নিয়ে দিনের অনেকখানি সময়ই ব্যস্ত থাকে এবং সেইভাবে তার মন ও স্বভাব অনেকখানি গড়ে ওঠে। এমন লোক আছে যাকে কাজের খাতিরে সংসার ও স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয় বহুদিন ধ'রে। অনেক আছে যাদের সপ্তাহান্তে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলন হয়। আবার অনেক স্বামীকে বাড়ীতেই থাকতে হয় অহরহঃ স্বজনসংযোগে।

বড় চাকুরে বা মোটা মাইনে পাওয়া স্বামীর ভার্য্যা হওয়া আমাদের দেশের সাধারণ সব মেয়েরই প্রায় কাম্য জিনিষ। মেয়ে-মহলে তার গর্ব্ব কত! নিয়মিত দেখা—নিয়মিত বিরহ! বাঁধা মাইনে,

বাঁধা যাত্রা। ব্যবসা বা কারবার যে স্বামীর পেশা তাকে নিয়ে স্ত্রীকে অনেক সময় ভুগতে হয়।



মেয়ে মহলে স্বামীর কথায় শত-মুখ হ'য়ে উঠে

আর্থিক অনটনের ভয় ত আছেই যেমন কারবারে লাভ লোকসান দুইই আছে; তা ছাড়া স্ত্রীরা নাকি সে স্বামীদের ষোল আনা পেতে পারে না। ব্যবসা নেশার মত তাদের পেয়ে বসে—কাজ কাজ কাজ—সর্ব্বদাই তাই নিয়ে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। পেশার ওপর নেশা যাদের বেশী তাদের নিয়ে স্ত্রীদের বিপদ ছাড়া আর কি?

আবার খেয়ালী বা ভবঘুরে স্বামীদের স্ত্রীরা সদাই বিব্রতা। ধরুন যে স্বামী বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ান কাজ নিয়ে হঠাৎ যখন তিনি বাড়ী ফেরেন মিলনের যেন শুভলগ্ন সেটি, উৎসব পড়ে যায়। নতুন ক'রে তারা পায় দুজনকে কিন্তু তার-



হাজারো হিতকথা ও অশ্রুপাত

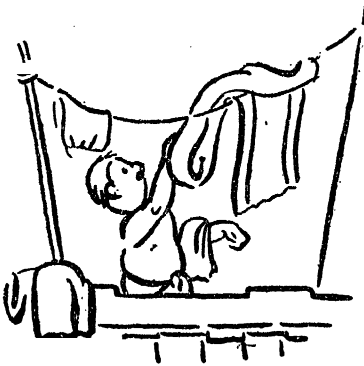
পরই আবার ছাড়াছাড়ি, জিনিষপত্র গুছানো, বিদেশে খাওয়া শোওয়া সম্বন্ধে হাজারো হিতকথা—তারপর অশ্রুপাত।

যে স্বামীরা থিয়েটার বা সিনেমা সংক্রান্ত কাজে জড়িত তাদের স্ত্রীদের সমস্যা খুবই গুরুতর। স্ত্রীরা স্বামীর অদর্শন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সহ্য করতে পারে কিন্তু যেখানে অন্যমেয়ের সাথে স্বামীর মেলা মেশার

সম্ভাবনা সেখানে পাঠিয়ে স্ত্রীরা মোটেই নিশ্চিন্ত নয়। সেই জন্য সিনেমা থিয়েটারের কাজের ওপর স্ত্রীলোকের একটা বিজাতীয় আক্রোশ থাকে। বিশেষতঃ যাদের স্বামীদেবতারা অভিনয়ের অংশ গ্রহণ করে। এমন শোনা গেছে অভিনয় দেখতে দেখতে উত্তেজিত স্ত্রী তার স্বামী-নায়কের নায়িকাকে জুতা ছুঁড়ে উপহার দিয়েছিল। অবশ্য অভিনেতা হিসাবে প্রচুর নাম করার পর তার স্ত্রীর গর্ব্ব করার থাকে অনেক কিন্তু নারীর সশঙ্ক মনের কাছে এ গর্ব্বের দাম বেশী নয় অভিনয়শিল্পীর কাছেও স্ত্রীর এই আচরণ মোটেই প্রীতিকর নয়। চিত্রশিল্পী ভাস্কর শিল্পী বা কোন শিল্পস্বভাব লোকের পক্ষে বিবাহিত জীবনে শান্তিরক্ষা করা একটু শক্ত হ'য়ে পড়ে। তাদের মধ্যে আত্ম-সৃষ্টির একটা জাগ্রত চেতনা থাকে যা তাদের শিল্প সাধনায় প্রেরণা যোগায়। শিল্প পূজার এই প্রেরণা এত বড় যে, দাম্পত্যের মধ্যে সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পারে না। প্রতিনিয়ত তাই বাধে, শান্তি ভেঙ্গে যায়—দাম্পত্যের দাবীগুলি বারবার প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ফিরতে থাকে। শিল্পীর জীবনে দাম্পত্য বেশীর ভাগই তাই অভিশাপ বিশেষ। অবশ্য অনেক বিবাহ দেখা গেছে যার পরে চূড়ান্ত খেয়ালী স্বামীও দাম্পত্যের



সংসার বনাম ষ্টুডিও



ভিজে সাড়ীগুলি নিজেই ছাদে মেলে দেয়

কঠিন শাসনে সংসার-সর্ব্বস্ব হয়ে পড়েছে। নিয়মিত বাজার করে সে, ছেলে মেয়েদের পড়ায় আরও কত কাজ ক'রে স্ত্রীকে সাহায্য করে। এমন কি ভিজে সাড়ীগুলি ছাদের রৌদ্রে মেলে দিতেও ইতস্ততঃ করে না। তার স্ত্রী হয়ত গর্ব্ব ক'রে বলে যায় পাড়ার মেয়েদের কাছে—কত কষ্টে সে স্বামীর 'কাব্যিরোগ' সারিয়েছে—তারই বিশদ বর্ণনা।

আসুন এইবার আমরা আমাদের সেই পরিচিত দম্পতির বাড়ী আর একবার উঁকি দিয়ে আসি। হোক্ না রাত্রি!

আড়ালেই থাকা যাক্ জানলা দিয়ে কিছু কিছু কথা ত শোনা যাবে। ঘর যে অন্ধকার! তা হোক্ আলোতে কিই বা দেখবেন? দুজনকেই ত চিনি আমরা। তাছাড়া—

ঐ শুনুন ওরা কথা বলছে।

—কে বলেছিল তোমায় অত দামী কাপড় আনতে?

—রাগ করছো কেন আমি কি দামের কথা বলেছি?

—সোজা বলছো না কিন্তু লক্ষ্যটা ত তাই, কি দিয়েছ আমায় এ পর্য্যন্ত? গয়নার কথা ছেড়েই দিলাম—কাপড় জামা? ভদ্রসমাজে প'রে যাবার মত কি আছে আমার?

—কেন তোমার কি কিছু নেই? সেই শান্তিপুরী—

—থাক্ থাক্ সেই খানাই চিনে রেখেছ—মহিম বাবুদের বৌ ওরকম কাপড় দুবেলা পরে—তার ওপর বাক্সে তার নানারকম কাপড় জামা ঠাসা।

—দেখ রাণী আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—আমি মহিম বাবু নই। তোমাকে তোমার খুসীমত যা তা আমি দিতে পারবো না—

—তা পারবে কেন? সব ব'লে কোন জিনিষ আছে কি? তোমার না থাকতে পারে, আমার থাকবে না কেন?

—তার উত্তর আমি জানি না। মোট কথা আমি যা দেব তাইতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে—এই আমার শেষ কথা।

—ছিঃ রাণীর স্বামী হ'য়ে তোমার ওকথা বলা উচিত হ'ল না সতীশ। স্ত্রীর সামান্য অভিমান তুমি ভাঙ্গতে 'পার্‌লে না? দেখদেখি এই তারায়

ভরা সুন্দর রাত্রিটা তোমাদের দুঃখ দেখে হতপুলক হয়ে আছে। আর রাণী, তোমারও প্রশংসা করতে পারলুম না। রাগের মধ্যে দিয়ে তোমায় দাবী আদায় করার চেষ্টা ভুল হয়েছে।

আচ্ছা, পারি ত কাল সন্ধ্যায় এসে আবার দেখে যাব।

সকালে গুমোট ভাব নিয়েই সতীশ কাজে বেরিয়েছে। দিনের আলো আর কর্ম্মজগতের চঞ্চল ছোঁওয়া লেগে মনটা তার কখন যে শুধরে গেছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি। বিকালের দিকে ছোট খাটো একটা দালালি কাজের কমিশন হিসাবে কিছু টাকা তার হাতে এসে গেল। এ টাকা সে পাবে বলে আশা করেনি সুতরাং মনটা তার নেচে উঠলো খুসীতে।

বাড়ী ফিরতে আজ একটু দেরী হয়েছে।

সতীশের সঙ্গে সঙ্গে চলুন আমরাও দেখে আসি কালকের ক্ষত স্থানটা কেমন আছে।

রাণী আজ ইচ্ছে করেই একটা খারাপ কাপড় প'রে আছে। বোধহয় স্বামীকে দেখানোর জন্যই। রাগ তার তখনও যায় নি।

'রাণু' সতীশ বাড়ীতে ঢুকেই ডাক দিল। 'কই শিগ্‌গির এসো' কণ্ঠে তার স্নেহ ও দরদ মেশানো।

কথা নেই রাণীর মুখে। দেহটাকে শুধু টেনে ছিঁচড়ে যেন আনলো তার সামনে।

—ধরো, ধরো শিগ্‌গির যা ভারী!

কি ওটা? একটা বড় প্যাকেটের মত দেখছি না! আলোয় নিয়ে রেখে এল রাণী। মনে তার কৌতুহল, মুখ কিন্তু জোর ক'রে ভার ক'রে রাখা হয়েছে।

—খুলেই দেখ ওটা। খুললে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

অপটু হাতদুটির নানা কসরতে খুলে গেল প্যাকেট, ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো দামী জর্জ্জেট, সিল্কের একটা চুমকি-দেওয়া ব্লাউজ— সিল্কের ব্রেসরি......আরও কয়েকটি জিনিষ। সতীশ তখন হাত পা ধুতে বাথরুমে।

—আচ্ছা, পয়সাগুলোর সর্ব্বনাশ করতে কে বলেছে শুনি ?

—কেন, পয়সা এলে সে সর্ব্বনাশকে সঙ্গে করেই আনে। পা মুছতে মুছতে উত্তর দেয় সতীশ।

—আচ্ছা, এত আনার কি দরকার ছিল ? এ মাসে আর কোন খরচ-পত্র নেই বুঝি ?

—আছে গো আছে, তার জন্যে টাকাও আছে।

—কিন্তু করেছ কি ? সবগুলোই যে বেশ দামী ! রাণীর মুখ এখন বেশ উজ্জ্বল।

—তুমিই কি কম দামী নাকি ? রাণীর যথাযোগ্য কি আর হয়েছে ?

—থাক আর ঠাট্টা করতে হবে না—আচ্ছা এই দুলটা আমার কানে পরিয়ে দাও ত একটু।

সতীশ দুলটা কানে ঝুলিয়ে দিল। এবং তারপর রাণীর মুখখানি দু'হাতে তুলে ধ'রে কী যে করলো আমি অন্যদিকে তাকিয়ে তা আর লক্ষ্য করিনি।

—চল খেতে দেবে চল। আবদারের আভাষ সতীশের কণ্ঠে।

—কেন, পেট ভরল না বুঝি ? দুষ্টু হাসি হাসে রাণী।

যাক্ আশ্বস্ত হওয়া গেল। রাত্রিটা ওদের ভালই কাটবে। আজ সতীশের ভাগ্য দেখে হিংসে হচ্ছে নিশ্চয়ই—সত্যিই বুদ্ধিমান সে। জিনিষ পত্র উপহার দিয়ে মেয়েদের চমক লাগিয়ে দেওয়া অন্ততঃ মাঝে মাঝে খুশি করা স্বামীদের যে একান্ত দরকার তা বলাই বাহুল্য। তার জন্যে অজস্র অর্থব্যয় করতে যে আমি বলছি তা নয়—সে আপনি আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের অনুমতি নিয়েই করবেন।





শুধু আলো শুধু ভালবাসা

ছন্দ এসে যাদের জীবনে অযাচিতরূপেই ধরা দেয় তাদের ভাগ্যবান বলতে হবে। কিন্তু যেখানে ছন্দভঙ্গ হবার হাজার উপাদান থেকেও তা অটুট আছে, সুর-সঙ্গতির ত্রুটিমাত্র নেই সেখানেই প্রশংসনীয় বুদ্ধিমত্তা আছে বলতে হবে বৈকি!

অনেকের মতে (বোধহয় বিবাহিতদের প্রত্যেকেরই হবে) দাম্পত্য-জীবনে ছন্দ একটি ভঙ্গুর জিনিষ। এটিকে ভাঙার মধ্যে যতটা মোহ আছে, রাখার মধ্যে হয়ত এতটা উৎসাহ নেই। আবার মজা

আরও একটি এই যে ছন্দের ঠুন্‌কো রূপটি ছোট জিনিষের চোট সইতে একেবারেই পারে না—বড় আঘাতে আবার হয়ত টিকে যায়। ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতি যে দাম্পত্যের রাজ্যে অনা-সৃষ্টি বিপ্লব ও হাহাকার গড়ে তুলেছে এমন নজিরের অভাব হবে না। অনেকে আমার মতের সঙ্গে যে


দাম্পত্যছন্দের নমুনা

একমত হ'বেন তাতে সন্দেহ নেই তবে তাঁরা এটাও বলবেন, "ওসব খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি হে বাপু! যা হবার নয়..." অর্থাৎ তাঁরা নাকি প্রভূত চেষ্টা ক'রেও কোন সুরাহা করতে পারেননি।

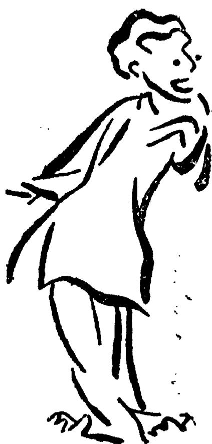
এমনই একজনের কথা জানি—প্রচণ্ড 'বিউটি স্পটের' ভক্ত। খুঁৎখুতে মন তার—মেয়েদের মুখে ঐ 'স্পটের' জন্যে সে যেন লালায়িতপ্রায় হয়ে থাকতো। বিবাহের পরে নববধূর মুখচন্দ্রে সে ঐ বস্তুর সন্ধান করছিল। তার চোখ যখন হাতড়ে বেড়াচ্ছিল খুঁজে, এমনই লগ্নে সে হুমড়ে পড়লো


বিউটিস্পটের বাহুল্য

কি যেন দেখে। বিউটিস্পট সে পেয়েছে কিন্তু পাশাপাশি দুটি কাল আঁচিলকে সে বরদাস্ত করবে কেমন ক'রে ?

সৌন্দর্য্যে নিখুঁত কেউ বাস্তব জগতে থাকতে পারে কিনা আমার জানা নেই। সৌন্দর্য্য কথাটাই ত ব্যক্তিগত এবং প্রত্যেকের নিজস্ব রুচির জিনিষ ওটা। স্ত্রী নিখুঁত সুন্দরী হবে বা স্বামী নিখুঁত সুন্দর হবে কল্পনা আপনি করতে পারেন কিন্তু এই নিখুঁত হবার গ্যারাণ্টি দেবে কে ? রূপ নিয়ে যারা অতৃপ্ত তাদের ভরসা কিছু না থাকলেও আশ্বাস এই থাকতে পারে যে ত্রুটি মানুষমাত্রেরই আছে। আর এক ভদ্র-লোকের কাহিনী জানি। বিবাহের ঠিক পরের কথাই বলছি। ভদ্রলোক স্ত্রীকে দেখে খুসীই হলেন খুব—শুভদৃষ্টির শুভ সুযোগে মন তাঁর যেন রঙে ভ'রে উঠলো। কিন্তু কোন অসতর্কক্ষণে স্ত্রী যখন আনন্দের অব্যক্ত ভাবাবেগ চাপতে না পেরে হেসে ফেলে তখনই হয় বিপদ। ভদ্রলোকের মনগড়া স্বপ্ন এক নিমেষেই চুর হয়ে যায়। আসল কথা, হাসলে মেয়েটিকে বিশ্রী দেখাতো। দাঁতগুলি তার সত্যই নাকি অসুন্দর ছিল।

তাই বলছিলাম দাম্পত্য-জীবনের প্রথম পাদক্ষেপে দৈহিক সামান্য ত্রুটি কতখানি বড় হয়ে ওঠে এবং সুরসঙ্গতির সুত্র ছিন্ন করে দেয়!



প্রকৃতির দেওয়া রূপ বা রূপের কোনও ত্রুটি, দুটিকেই মাথা পেতে নিতে হবে—ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা অসুবিধার কোনও পরোয়া না ক'রেই তারা আমাদের দেহটি অধিকার ক'রে বসে। সুতরাং সেখানে বক্তব্য কিইবা থাকতে পারে ? বক্তৃতা দিলেই বা ফল কি ? কিন্তু আরও অনেকগুলি বিষয় আছে যেগুলি হিসাব ও চেষ্টার চেক্ ভাঙিয়ে কেনা যায়।

বিনা আয়াসে দুনিয়ার কিছুই পাওয়া যায় না এটা যাঁরা স্বীকার করবেন তাঁদের নিয়েই আমার কথা এবং তাঁরা যদি নারী হন এবং



পত্নীত্ব পেয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের উদ্দেশ করে বলা যেতে পারে যে কর্ত্তব্য তাঁদেরও আছে—চেষ্টার প্রয়োজনও আছে। স্বামীর তাচ্ছিল্য বা উপেক্ষা কোন স্ত্রীই সইতে পারে না। সে তার সর্ব্বগ্রাসী অধিকার নিয়ত কায়েমী করে রাখতে চায় কিন্তু ক'জনেই বা জানে কেমন করে সে অধিকার রাখতে হয়। স্বামীর উপেক্ষাভাজন না হয়ে স্বামীকে মুগ্ধ ক'রে রাখা আচ্ছন্ন ক'রে রাখা আরও ভাল।

আপনার সুখটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পুরিয়া
করাইব পান—

সুধা যদি দেহপাত্রে পূর্ণ থাকে পানের আগ্রহ তখন উজ্জ্বল না হ'য়ে পারে না।

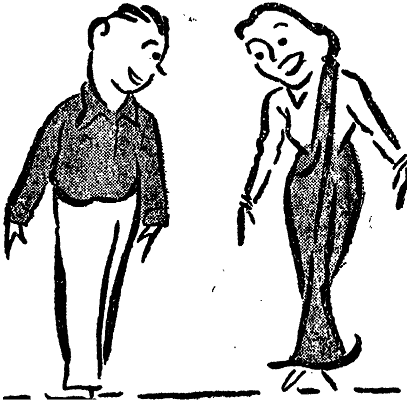
আসল কথা দেহসৌষ্ঠবে মোহিনী সাজবার যে সহজাত মেয়েদের আছে সেটা দোষনীয় নয়, সেটা তার স্ত্রীকেও অনেকখানি চর্চ্চা করতে হবে নিজেকে স্বামীর কাছে লোভনীয় করার কৌশলগুলির। সাজে পোযাকে ভঙ্গীতে কেন সে দুর্ব্বার আকর্ষণ সৃষ্টি ক'রবে না?

হাসিতে আলাপে গানে কেন সে উজ্জল হ'য়ে উঠবে না দুহাতে ফুল ছড়াবার মত? কবি আবার যেমন বলেছেন—

নারী যদি নারী হয় শুধু
শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো
শুধু ভালবাসা সুমধুর ছলে
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা
তবে তার সার্থক জনম।

স্ত্রীরা যেন ভুলে না যায় তারা নারীগোষ্ঠির একজন। বিবাহের মধ্যে হাজার কর্ত্তব্য থাকলেও নারীধর্ম্মের ত্রুটিটুকু প্রকৃতি সহ্য করে না।

একদিন না একদিন সে প্রতিশোধ নেবেই। যৌবনেই অনেক স্ত্রী স্বামীর ভালবাসা হারিয়ে ফেলে। অনেক কারণের মধ্যে যে একটা কারণ লুকিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে সেই সব স্ত্রীরা হয়ত রূপচর্চায় উদাসীন, সুষ্ঠু হবার সাধনা তারা করেনি। একটি কাহিনী বলছি—এক বৌদির কাছে শোনা তার ছোট বোন শীলার বিবাহ নিয়ে। শীলার সাথে বৌদির দেওরের বিবাহের সম্বন্ধ হবার অনেক আগেই তাদের মধ্যে মেলামেশার সূত্র ধরে ঘনিষ্ঠতার পাকা বনিয়াদ গড়ে ওঠে। দুজনে পরস্পরকে বেশ চিনেছিল এবং পূর্বরাগের সোনালি আলোয় দুজনের মুখ চোখ বেশ রঙিন হ'য়ে ছিল। শীলা তখন কারণে অকারণে নিজেকে মোহনীয় করার কি দুশ্চেষ্টাই না করতো—'আবার আসবেন কিন্তু' কথাটি বলতেই কত হেলেদুলে বেঁকেচুরে দাঁড়াতো সে। তারপর বিয়ে একদিন হ'ল এবং শুভকার্য্যের পর থেকেই শীলার কি পরিবর্ত্তন! সে ভাবলো তার কাজ ফুরিয়ে গেছে, আইনে পাওয়া বিবাহের অধিকারকে যেন সে একমাত্র দলিল ক'রে রাখতে চায়!


আবার আসবেন কিন্তু

এই প্রসঙ্গে 'মেকআপ' সম্বন্ধে কথা ওঠে। মেকআপের বাহুল্যটা দোষনীয় কিন্তু মেকআপের কিছুটা প্রয়োজন আছেই আছে। বিশেষ মেয়েদের কাছে। সিনেমা ষ্টারদের গ্ল্যামার যদি কেউ নিজের দেহ-সৌষ্ঠবে ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁকে নিবৃত্ত করবার


গ্ল্যামার

কিছু নেই। কেন না অনুকরণটা খারাপ হ'লেও গ্ল্যামার অবশ্য রুচিগত ও ব্যক্তিগত হলে খারাপ নয়। তবে গ্ল্যামার এমন একটি জিনিষ নয় যা মুখে চোখে গ্লু দিয়ে এঁটে দেওয়া যায়। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে মেজে ঘ'ষে তার ওপর একটা জলুস্ দেওয়া যায় মাত্র।

যৌবনকে স্বামীর সামনে শোভন ক'রে তুলে ধরা দরকার। এতে লজ্জা কি আছে? পুরুষকে বশ করার বা আকর্ষণ করার যে হাজারো-কৌশল ছলাকলা নারী অতীত যুগে জানতো (আজও যে জানে না তা নয়) ঘরে স্বামীর কাছে সে তার প্রত্যেকটির চর্চ্চা করুক না কেন! বিবাহরূপ বিরাট বটবৃক্ষের নিশ্চিন্ত ছায়ায় সে যেন আজকাল আইনে পাওয়া অধিকারটুকু কামড়ে বসে থাকতে চায়। পুরুষকে জয় করার দুরন্ত চেষ্টা যেন আজ ঘুমিয়ে পড়েছে।



পুরুষকে জয় করার নমুনা

অনেকে তর্ক তুলতে পারেন—তাঁরা বলবেন যৌবনকে বড় ক'রে ধরলে যৌনবৃত্তিই জাগবে। সেটাই কি হবে দাম্পত্যপ্রণয়ের সার্টিফিকেট? তা নয়। শুধু সেটার ওপরই যে ভালবাসা টিকে থাকবে আমি তা বলি না। তবে মনে রাখতে দোষ কি যে ভালবাসাও দেহধর্ম্মী। প্রণয়কে যত পবিত্র নামাবলী ঢাকা দিয়েই রাখুন—দেহধর্ম্মের উগ্র সুরাগন্ধ তার মধ্যে লুকানো যায় না, নাকে লাগবেই।

দেহটা ছোট নয় এবং দেহকে আশ্রয় ক'রে যৌবনের যে মন্দার ফুল ফোটে—জীবনে একবার মাত্র যার সৌরভ বাতাসকে মাতাল ক'রে তোলে সেটাও খুব সুলভ নয়। যৌবনকে পরিপূর্ণভাবে ফোটানো আর তাকে বাঁচিয়ে রাখা বড় কাজ বৈকি।



দেহকে কবি অর্ঘ্য দিয়েছেন—

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী…

দাম্পত্যজীবনের মধ্যে দেহ ও দৈহিক লাবণ্য বড় অংশ গ্রহণ করে। মেয়েদের অসুন্দর দেখা-নোটা এক রকম অপরাধ বলতে হবে। যতই দাম্পত্যকে ধর্ম্ম আখ্যা দিন আর সমাজনীতির নানা অনু-শাসন দিয়ে ঘিরে রাখুন মেয়েরা যে পার্থিব মোহ দিয়ে গৃহকে ঘিরে রাখে তার ওপরই দাম্পত্য সুখ দাঁড়িয়ে থাকে। গৃহলক্ষ্মী বললেই তার লক্ষীত্ব বা লক্ষ্মীশ্রী থাকা চাই!



ঢাকা দেবার কৌশল

স্ত্রীলোক সাধারণতঃ সজ্জা ভালবাসে। তাকে পরি-ষ্কার থাকতে হবে। সুদৃশ্য রংয়ের পোষাক মনোরম ক'রে পরতে হবে। দামী কাপড় অনেককে পরতে দেখা গেছে যাতে তাকে আলুথালু-জড়ানো পুঁটুলি মনে হয়। পোষাক পরার সেই ভঙ্গীই ভাল যা দেহের যৌবনশ্রী ফুটিয়ে তুলতে পারে অথচ তাকে উদ্ধত করে না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যার অর্থ ঢাকা দেওয়ার কৌশলের ওপরই সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। য়ুরোপীয় মহিলারা কিন্তু একথা ভুলতে বসেছে।

একটি অপেরা ষ্টারের গল্প শুনেছিলাম। এই ষ্টারটি ছিলেন অত্যুগ্র প্রসাধনবিলাসিনী। তার মেকআপ কৌশল ছিল সর্ব্বজানিত ব্যাপার, অবশ্য স্বামী এতে খুবই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। একদা কোনও প্রয়োজনে স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে

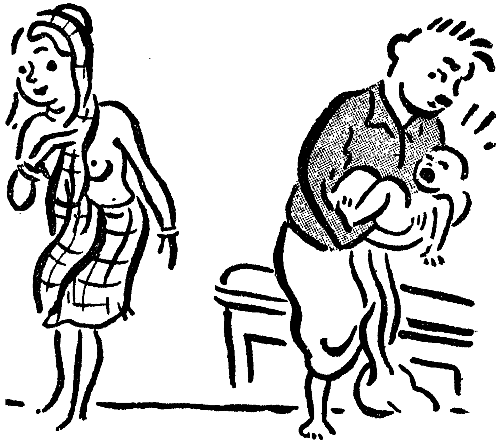
জরুরি খবর পাঠালেন। ষ্টারটি সেই সময় ঘরোয়া পেষোকেই ছিলেন, মেক-আপের কোনও বালাই ছিল না অঙ্গে। স্বামী কাছে এসে স্ত্রীকে দেখেই শিউরে উঠলেন— কোনও কথা মুখ দিয়ে বেরুলো না তাঁর। চোখ ফিরিয়ে সরে পড়তে হ'ল অন্যদিকে। অর্থাৎ এ অবস্থায় তিনি কোন দিন স্ত্রীকে দেখেননি।



য়ুরোপীয়দের সজ্জা-সংক্ষেপ

ব্যাপার বুঝে পত্নীও লজ্জিত হয়ে নিজের কক্ষে ছুট দিল এবং যথারীতি সেজেগুজে আবার হাজির হলেন। বলা বাহুল্য এবার আর স্বামী আতঙ্কগ্রস্ত হননি।

আমাদের কাছে এ কাহিনী হাস্যকর লাগবে কিন্তু ও দেশে মেক আপ রীতি এমনই অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমাদের



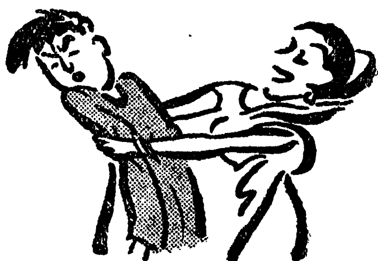
মেকআপের অপভ্রংশ

দেশের স্বল্পবিত্ত যাঁরা, দুখানি কিম্বা একখানি ঘরেই যাঁদের জীবন যাপন করতে হয় তাঁদের কেউ হয়ত স্ত্রীকে মেকআপ-বর্জ্জিতা দেখে শিউরে উঠবেন না, এমন কি মেক-আপের অপভ্রংশ গামছা-জড়িতা দেখেও না।


অবসর পেলেই মেয়েরা রূপচর্চ্চা করে

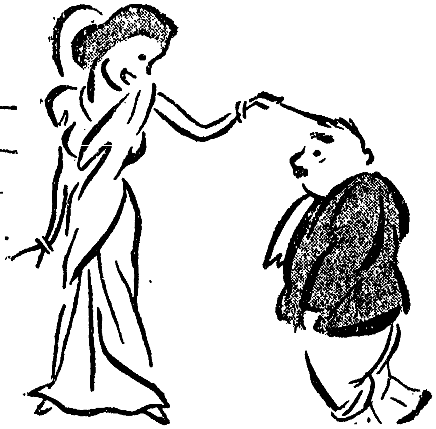
বিলাসিতা বা কৃত্রিমতা খারাপ কিন্তু প্রকৃতিদত্ত রূপকে বা সৌন্দর্য্যকে আরও পরিস্ফুট করা দোষণীয় নয়। এটাকে একরকমের আর্ট বলা যেতে পারে। আমাদের প্রাচীন ভারতেও দেখি প্রসাধনের প্রসার ছিল, রূপসাধনার, বসন-বিন্যাসের কী অপরূপ কৌশলই না ছিল তখন!

পার্ব্বতী নাকি শঙ্করকে লাভ করতে কঠিন তপস্যা করেছিলেন। আমাদের দেশের কুমারীরাও দেবসদৃশ স্বামী পাবার জন্যে শিবপূজা করে। আধুনিকারাও স্বামী লাভ করেন আরও কঠোর তপস্যায়, প্রেমের ফাঁদ পেতে থাকতে হয় অনেক সময়। যাই হোক তপস্যায় যাকে পাওয়া গেল তাকে হাতে রাখতে অনেকেই কেন উদাসীন হয়ে পড়েন বুঝি না।


হাতে রাখা মানে জবরদস্তি নয়

যে স্বামী স্ত্রীর প্রেমে প'ড়ে স্ত্রীলাভ করে তাকে দিয়ে স্ত্রী যা ইচ্ছে তাই করাতে পারে। শুধু আঁচলের মহিমাতেই তারা থাকে প্রেমজর্জ্জর হ'য়ে। টিকি ধরেও নাকি তাদের ওঠানো বসানো সম্ভব হ'য়ে থাকে অন্তঃপুরের পর্দ্দার অন্তরালে।

এই অবস্থায় স্বামীকে নিজের মত ক'রে গড়ে নেওয়া তাকে বড় করা বা বড় কাজে প্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করা স্ত্রীর পক্ষে সহজ। কিন্তু ক'জন বা তা পারে? স্ত্রীরা তাদের ত্রুটি আবিষ্কার করে অতি দেরীতে যখন আর উপায় থাকে না। স্বামী হয়ত তখন তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।


মৃদু হস্তক্ষেপ মাত্র

অনেক স্ত্রীকে দুঃখ ক'রতে শুনেছি—স্বামীর সঙ্গে দিনরাত্রির মধ্যে তাদের খুব কমই সম্বন্ধ। প্রভাতের চা-পান থেকে রাত্রির শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত তাদের ঘনিষ্ঠতা নেই বললেই হয়। অত্যন্ত বাঁধাধরা দু' একটা কথা আর যন্ত্রের মত সেই কথামত কাজ এইভাবেই তাদের দিন চলে। হয়ত ছেলেমেয়ের জন্মও হচ্ছে তাদের ঘরে কিন্তু কি নিষ্প্রাণ অসাড় তাদের জীবনস্রোত!

স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক এখানে অতি শিথিল। বাড়ীটা হোটেল বিশেষ হয়ে পড়ে। বিশেষ মতভেদ বা ঝগড়া হয় না বটে কিন্তু এরকম নিঃসম্পর্ক ছাড়াছাড়া ভাবের থেকে ঝগড়াঝাটিও ভাল। অনেকসময় এরকম জায়গায় উভয়েরই মনে নানারকম কুসন্দেহ গজাতে থাকে।

সকলেই বলবেন স্বামী-স্ত্রীর এই জীবন মোটেই আদর্শ নয়। আইনত হয়ত সব ঠিক আছে, গার্হস্থ্য আইনের কোন জায়গায় ব্যতিক্রম হয়নি। স্বামী ব্যভিচার কচ্ছে না, স্ত্রীরও সতীধর্ম্ম অটুট। উভয়েই পুত্রকন্যার জনক-জননী। কিন্তু হায় জীবনের আনন্দ কোথায়? শুধু মাত্র বেঁচে থাকাই কি সব? যেন 'জীবন শুধুই জীবন যাপন।'

যৌনতত্ত্ববিদ্‌রা এ রকম ক্ষেত্রে একটি জিনিষ আবিষ্কার করার চেষ্টায়

থাকে। স্বামী-স্ত্রীর যৌনজীবনের পূর্ণতৃপ্তি না হ'লে পরস্পরের এরকম বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। স্ত্রীর আসঙ্গলিপ্সা স্বামী পূর্ণভাবে তৃপ্ত ক'রতে না পারলে স্ত্রীর মনোজগতের কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি লুকিয়ে থেকে যায় এবং সংসারের সব কিছুর মধ্যেই তা আত্মপ্রকাশ করে। অত্যন্ত কাছাকাছি সর্ব্বক্ষণ থাকার ফলে পরস্পরের সম্পর্ক ভালবাসাহীন হয়ে পড়ে এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। ইচ্ছাকৃত বিরহ, কিছুটা সময় ছাড়াছাড়ি দাম্পত্যজীবনে পথ্য বিশেষ বলা যেতে পারে। কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা মন্দ নয় বিশেষ স্ত্রীর দিক থেকে। নারীত্বের একটা রহস্য যেন তাকে ঘিরে থাকে।

পুরুষকে নিয়ে হাত ধ'রে চলার ছন্দ থাকবে স্বামী স্ত্রীর দৈনন্দিন যাত্রা-পথে। স্বামীকে সর্ব্ব দিক থেকে সে বুঝে নেবে, তার রুচি তার স্বভাব পরখ করবে এবং সেই মত পরিবেশন করবে সব এমন কি নিজেকেও। পরিবেশন কথা থেকে একটা কথা মনে এল। এক রসিক ব্যক্তি বলেছেন পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করার অনেক পথ আছে তবে সবচেয়ে



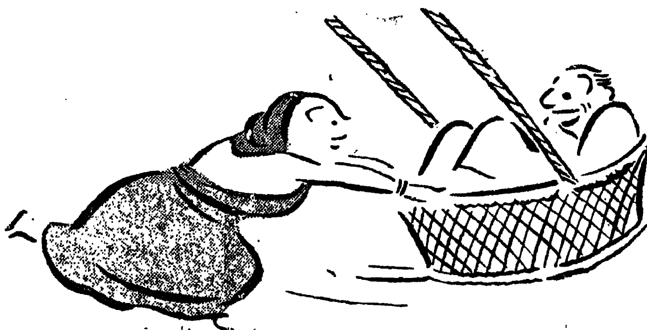
হৃদয় দখলে শর্টকাট

শর্টকাট্ হচ্ছে যেটি রসনার মধ্যে দিয়ে গেছে। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের যোগাযোগ পুরুষের কাছে বেশ আকর্ষণের। স্ত্রীরা এই সুযোগটী গ্রহণ করতে আজকাল যেন ভুলে যাচ্ছে মনে হয়।

বুদ্ধিমতী স্ত্রীরা জানেন স্বামীর কাছে সোহাগ আদায় করার কৌশল। কখনও গল্পে কখনও গান গেয়ে কখনও সেবা যত্ন ক'রে কখনও বা শাসন

ক'রে বা উপদেশ দিয়ে স্বামীকে তিনি রাখেন আচ্ছন্ন ক'রে। কখনও তাঁর মান হয় কখনও তিনি মানভঞ্জনের ভূমিকায় নামেন। আমাদের পরিচিত চন্দ্রবাবুর স্ত্রীর গল্প শুনলেই বোঝা যায়। স্ত্রী যেন চন্দ্রবাবুর মাথার মণিবিশেষ। চন্দ্রবাবু যুবক নন, স্ত্রীরও বয়েস হয়েছে কিন্তু স্বামীটিকে যে কিভাবে রেখেছেন তিনি—সে এক রহস্য বিশেষ। ভদ্রলোক যেন বুড়ো হয়েও হলেন না—কাঁচাপাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে পানটি চিবুতে চিবুতে আজও তিনি সর্ব্বদা রসাপ্লিত হয়ে থাকেন। ভদ্রলোক রোজই তাঁর বাড়ীতে যাবার নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু যাওয়া আর হয় না। তিনি বলেন দেখুন কাল সারাদিন গিন্নী কি সেবাই করেছে মশায়—কানের পাশের পাকা চুলগুলি সব তুলে দিয়েছে।

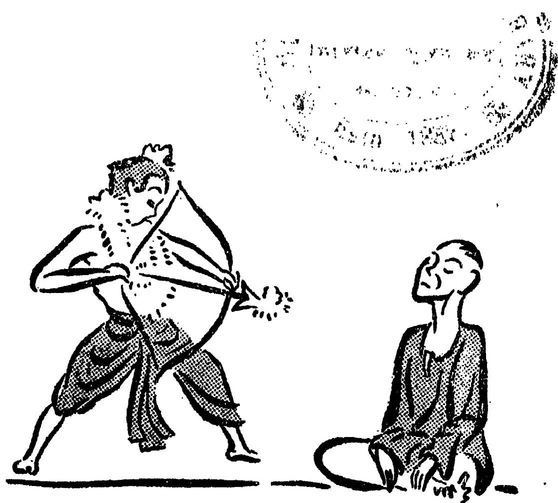
সেদিন কাজের ফাঁকে সময় ক'রে চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উঠি। অসময়ে গিয়েছিলুম যে তা নয়। উঠোনে পা দিয়েই ডাক দিলুম। ভিতর থেকে সাদর অভ্যর্থনা এল কিন্তু মানুষ কেউ এল না। এগিয়ে গেলাম, দালানে পা দিয়েই দেখি এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। চন্দ্রবাবু দালানে



রাম-খোকা না হলেও চন্দ্রবাবু বটে

দোদুল্যমান একটি দোলার বসে এবং তস্য গৃহিনী পাশে দাঁড়িয়ে বেশ দোলা দিচ্ছেন। দুজনের মুখই বেশ হাসিখুশি। আমাকে দেখে ভদ্রমহিলা একটু সরে দাঁড়ালেন মাথায় কাপড়টা টেনে।

যৌবনসীমান্ত পার হয়ে গিয়ে কটা লোক পারে জীবনকে এভাবে রসসিক্ত ক'রে উপভোগ করতে?



প্রেমের শিশমহল

প্রেমের দেবতা মদনদেব যখন হরকোপানলে ভস্ম হয়, রতির বিলাপ শুরু হ'ল। শেষে মহাদেবের কাছে অনেক স্তবস্তুতি করায় ফল হ'ল এই যে, মদন সূক্ষ্মদেহ লাভ ক'রে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে, তরুণ তরুণীর হিয়ায় হিয়ায় এবং সারা বিশ্বময়।

প্রেমের উপমা দিতে তাই এমন জিনিষ নেই যার নাম করা হয় নি।

'প্রেম নহে মোর মৃদুফুল হার,' 'আমার প্রেমের আকাশ' প্রেমের ফুল বাগিচা, প্রেমের নদী, সাগর, প্রেমের চাঁদ, তারা, প্রেমের কুঞ্জলতা,

বিহগ, প্রেমের পদ্ম সরোবর—প্রেমের কি নয়? প্রেমকে বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রেম নিয়ে রচিত হয়েছে কত সাহিত্য কত কাব্য কত চিত্র কত গান কত শিল্প আরও কত কি।

আবার কোন সংসার-প্রবীণ বৃদ্ধ হয়ত এটিকে বলেছে বাঁদরামি, কেউ হয়ত বলতে পারে নিছক দুর্ব্বলতা।

কাব্যে ও সাহিত্যে প্রেমকে স্বর্গীয় স্তরে তোলা হয়েছে, প্রেমকে 'কামগন্ধহীন' করাও হয়েছে।

কত বৈজ্ঞানিক আবার এ বস্তুটিকে সেই স্বর্গ থেকে টেনে নামিয়ে এনেছেন মর্ত্ত্যে, শুধু মর্ত্ত্যে কেন মর্ত্ত্যের মাটিতে। তাঁদের ভাষায় প্রেম যাই হোক স্বর্গীয় নয় দেহাতীতও নয়। এই দেহকে জড়িয়েই তার লীলা। 'রজকিনী-প্রেম বিকশিত-হেম কামগন্ধ নাহি তায়' হয়ত কোন উচ্চস্তরের প্রেম হবে। 'প্লেটোনিক' প্রেমের মত অবাস্তব কিছু হতেও পারে।

যাই হোক প্রেমের তত্ত্ব ধর্ম্মের তত্ত্বের মতই গুহায় নিহিত। অনাদি কাল থেকে গবেষণা চলেও এর তত্ত্ব ধরা পড়লো না চিন্তাবীরদের মনে। কিন্তু গবেষণার অনুবীক্ষণে ধরা না দিলেও এমনি খেয়ালী স্বভাব এ বস্তুটির যে, অনেক জায়গায় অতি সহজেই ধরা দিয়েছে এ। একটি কাঁচা বয়েসের লেখাপড়া-না-জানা কুমারীর কাছে হয়ত সে ধরা দিল আচম্বিতে। প্রেম কথাটির বানান হয়ত সে জানে না কিন্তু তার চোখে মুখে সর্ব্বদেহে ও মনে প্রেম হয়ত এসেছে আচ্ছন্ন ক'রে জ্বরের মত; একটি তরুণ হয়ত না-জানা এই বস্তুটির উৎপাতের কত অঘটনই না ঘটিয়ে ফেলে তার ইয়ত্তা নেই। সারা রাত চাঁদের পানে চেয়ে হিম লাগান, গভীর রাতে নদী সাঁতরানো, গহন বন পেরিয়ে আসা বা দেওয়াল বেয়ে তিন তালার জানালায় হাজির হওয়া এসব প্রেমের-ইতিহাসে অতি তুচ্ছ ব্যাপার!

এই প্রেমের তাগিদেই মমতাজকে উপলক্ষ্য ক'রে একদিকে যেমন তাজমহল গড়ে উঠেছে আর একদিকে তেমনি হেলেনকে উপলক্ষ্য ক'রে ট্রয় নগর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

বড়ো ন

বিবাহের মধ্যে এই প্রেমের স্থান কতটুকু বা কতখানি এই নিয়ে আবার তর্ক আছে। অনেকে বিবাহকে প্রেমের সমাধি বলে অভিহিত করেন আবার দাম্পত্যপ্রেম বলেও একটা কথা আছে!

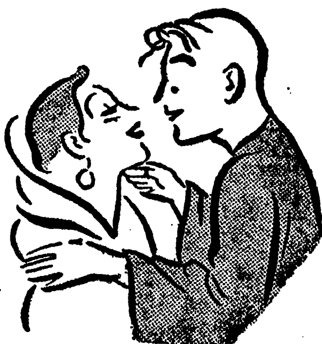
দাম্পত্য জীবনের অনেক চিত্র আছে যা থেকে তুটোরই প্রমাণ আপনি পাবেন। আধুনিক বিয়েতে যেখানে পাত্র ও পাত্রী নিজেরাই পছন্দ ক'রে বিয়ে করে শুধু পছন্দই বা কেন বহুদিনের মেলামেশার পর 'লভ-ম্যারেজ' হয় সেখানে কিছুদিন পরে গিয়ে হয়ত দেখতে পাবেন ম্যারেজ আছে কিন্তু লভ নেই। এই শ্রেণীর বুবু ও টুটুলদের জীবন-পাত্রে ভালবাসার ক্ষণস্থায়ী কর্পূর কখন যে উবে গেছে তা তুজনের কেউই জানতে পারেনি। তখন একদা হয়ত তাদের প্রত্যেকে আবিষ্কার করলো যে একজন অপরের ওপরে অন্যায় করছে। ভদ্রতা বিনিময় তখন হামেশা ঘটলেও বিস্মিত হবার কিছু থাকে না।

আবার এমন চিত্রও দেখবেন যেখানে স্বামী স্ত্রী কেউই হয়ত কোনদিন বুঝলো না যে প্রেম তাদের হয়েছে কিনা, ভালবাসার চুল-চেরা হিসেবই আর মাপজোপ থেকে তারা দূরেই চলছিল বা খেয়ালই ছিল না এদিকে অথচ তারা পেরেছে শান্তি দিয়ে তাদের ঘরখানি গড়তে। বিবাহকে হয়ত তারা সত্যিই জমকালো করে তুলেছে।

ইতিহাসে দেখা যায় প্রেমের সঙ্গে বিবাহের প্রায়ই কোন সম্পর্ক নেই। প্রেম ব্যক্তিগত মনের ক্ষুধা...বিবাহ হচ্ছে সমাজের বা রাষ্ট্রের নিয়ম পালন। সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে অনেকে ব্যক্তিগত প্রেমকে হত্যা করেছে। আবার অনেকে বিবাহের সমাধির ওপর প্রেমের জয়স্তম্ভ রচনা করেছে। আবার অনেকে হয়ত তুইএরই সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা করেছে। একদিকে সমাজ রাষ্ট্র পুত্র কন্যা বিবাহ স্ত্রী আর একদিকে নিঃসঙ্গ মন প্রেমের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রিয়তমার প্রমোদকুঞ্জ পানে অভিসারে চলেছে। একদিকে প্রজা সমাজ-বিধান কর্ত্তব্য আর একদিকে কাব্য সঙ্গীত শিল্প প্রেম স্বাধীনতা।

আধুনিক যুগে বিবাহিতা স্ত্রীরা সেদিনের এই নীতির যথেষ্ট দোষ

দেবেন। বাস্তবিকই তাই, এখনকার বড় সমস্যা হচ্ছে স্ত্রীরা কেন প্রিয়তমা হবে না। প্রেম ও কর্ত্তব্য একই জায়গায় এসে মিশুক না কেন? যে বিবাহ সামাজিক সৃষ্টি তা যখন জীবনে এলই তখন তার বুকে প্রেমেরও প্রতিষ্ঠা হবে না কেন?



স্ত্রীরা কেন প্রিয়তমা হবে না

এই সূত্রে আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো। রাখুদা বলেই ডাকতাম তাকে। সদ্য বিবাহিত এবং অতি সংসারী লোক। নিত্য স্ত্রীর গল্প, স্ত্রীর কথা আমাদের শোনাবেই শোনাবে। অন্য যে কোন প্রসঙ্গ হোক না কেন সে অবলীলাক্রমে তার নিজস্ব পত্নী-প্রসঙ্গে চলে আসবেই। হঠাৎ তার আর্থিক অবস্থা খারাপ হ'য়ে পড়লো এবং ক্রমে বেশ গুরুতর রকমই হ'তে চললো। রাখুদা একদিন তার গোপনীয় ডায়েরীখানা আমায় দেখায়।

যে জিনিষটা বেশী ক'রে চোখে পড়লো সেটা হচ্ছে—স্ত্রীকে সে প্রথমে ডাকতো কত রকম ক'রে। কতগুলো আদরের নামই রেখেছিল তার—আসল বীণা থেকে বীনু, বিনি, বীণ্ ইত্যাদি ছোট আকারের আরও কত এবং তার সঙ্গে কত বিশেষণ!

তারপর ক্রমে স্বরচিত ছোট নামগুলি মুছে শুধু বীণাই চল্‌লো কিছুকাল। তারপর তাও ক্বচিৎ মুখে বেরোয়। 'ওগো হাঁগো' রূপে চলে কিছুদিন। তাও পরে বিবাহিত জীবন যতই দীর্ঘ হ'তে থাকে কথাবার্ত্তায় কর্তৃবাচ্য কমে যায় কর্ম্মবাচ্য নেমে আসে। 'যাওয়া হোক না' দিয়ে গেলে হ'ত' ইত্যাদি ছুঁড়ে মারা ভাষা। কে জানে ভবিষ্যতে আরও কতদূর গড়াবে।

বিবাহে প্রেম জিনিষটির সাধারণ পরিণতি এমনই হ'য়ে দাঁড়ায়। স্ত্রী একদা প্রিয়তমার কোটায় প্রতিষ্ঠিতা থাকে তারপর নেমে আসে

অনেক নীচে। ভালবাসার অভিনয় হয়ত তখন চলতে থাকে, ভালবাসার দীপ নির্ব্বাণের পর।

ভালবাসা কথাটা নিয়ে অনেক ভুল ধারণা থাকে অনেকেরই মনে। নীল রং ভালবাসি, কাটলেট ভালবাসি, সিনেমা ভালবাসি এবং সবিতাকে ভালবাসি এ রকম কথা আমরা প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে ফেলি।

ভালবাসা ও ভাল লাগা কথা দুটোর তফাৎ মনে রাখা দরকার। হঠাৎ কোন জিনিষ যদি মনে রং ধরিয়ে দেয় তখনই সেটি ভাল লাগে। একটি মেয়ের গায়ের রংটি ভাল লাগে, কথা ভাল লাগে, তার হাসিটিও ভাল লাগে তাই বলেই আমি তাকে ভালবাসি একথা বল্লে দুঃসাহস হবে না কি?

ভালবাসা আরও গভীরের জিনিষ। জীবনে যখন তখন তা ফুটে ওঠে না যে যাকে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। তবে জীবনে একবার যে ফুটবেই এটা ঠিক। একজন রসিক লোক বলেছেন ভালবাসা হামের মত সবার গায়ে একবার ক'রে দেখা দেবেই।

ভালবাসার পবিত্র দীপশিখা জীবনে যখন জ্বলে ওঠে, তার আলোর সৌরভে সারাদিক আচ্ছন্ন হয় কিন্তু অল্পক্ষণ তার পরমায়ু। পৃথিবীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মধ্যে তা সহজেই যায় নিভে। সমুদ্রের তরঙ্গের চূড়োর ওপর প্রভাত সূর্য্য যে কণকমুকুট পরিয়ে দেয় পলকেই তার অভিষেক যায় ফুরিয়ে—এতই ক্ষণিক। ভালবাসার দেওয়ালী সারা জীবন জুড়ে জ্বালা চলে না।

একজন মনীষি বলেছেন মনুষের হৃদয়ে প্রেম ঠিক আতসবাজির মত—একবার অন্ধকার আকাশের বুক চিরে সোঁ ক'রে উঠে যায় রঙীন ফুলঝুরির আলিম্পন এঁকে। মানবাত্মার বিকাশের মত এই ভালবাসার স্ফুরণ জীবনে বার বার আসে না, তাই একবার ব্যর্থ হ'লে আর হয়ত তা জ্বলে না, জ্বললেও সেই দীপ্তি থাকে না। যৌবনের প্রথম ভালবাসা তাই আনন্দ উচ্ছ্বাস বেদনায় এত গভীর।

বিবাহ এই ভালবাসাকে স্থায়ী করার একটা চেষ্টা মাত্র। বিবাহে যদি

সত্যিই প্রেম বিকশিত হয়, যদি সোণালীর আলোর রংমশাল সত্যিই জ্বলে ওঠে তবে তা নিভতে বেশী দেরী হবে না এটাও সত্যি। যেমন অকস্মাৎ তার আলোর ঝলকানি আসে তেমনি হঠাৎ সে অন্ধকারে যায় লুপ্ত হয়ে। বিবাহ ব্যবস্থা তাই বিজ্ঞের মত এসে বল্লে—"এই টর্চ্চ নিভে যাবার আগে তোমার ঘরের বাতিগুলি জ্বেলে নাও। এই বাতিগুলি স্নেহ প্রীতি বন্ধুত্বের বাতি। তোমার বিবাহিত জীবনের আঙ্গিনাতে যে ফুটফুটে সন্তানগুলি এসে দাঁড়ালো তারাই ত নিয়ে এল হাতে ক'রে ঐ বাতি। ভালবাসার সোণালী রোশনাই নিতে গেলেও এগুলি তার বদলে কতকটা 'প্রক্সি' দিতে পারবে। তবে যদি এ রকম সন্তানদল কেউ না আসে তোমার আঙ্গিনায় তা হলে দুর্ভাগ্য বলতে হবে। তখন বাপু আর কি করবে, স্ত্রীর সঙ্গে 'পার্টনারশিপ' হিসাবে কোনও বিজ্‌নেস্ আরম্ভ করতে পার।

দেহতত্ত্ব প্রেমের অধ্যায়ে একটি আদি ও অকৃত্রিম বস্তু। সত্যিকার ভালবাসায় দেহ অবশ্য তুচ্ছ হ'য়ে যায় কিন্তু দেহকে ডিঙ্গিয়ে যাবার মত উচ্চাবস্থা কতক্ষণ টেকে এবং ক'জনের ভাগ্যেই বা ঘটে? তাই প্রিয়তমাকে যখন প্রগাঢ় প্রেম সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করে দিই প্রায় মুহ্যমানই করে দিই



সুস্থ-সুন্দর রূপই প্রেরণা জোগায়

বলতে গেলে তখন তার সুস্থ সুন্দর যৌবনখানি সামনে থাকা দরকার। অন্ততঃ কল্পনাতেও। তা না হ'লে এই সম্ভাষণের প্রেরণা আসতো কি না সন্দেহ!

এক প্রেমিকের কাহিনী শোনা যায়—বহুদিন বিরহের পর প্রিয়তমা-

মিলনের অপূর্ব্ব ক্ষণটিকে রোমাঞ্চময় করবার কত চেষ্টাই যে করেছিল ভদ্রলোক, কিন্তু প্রিয়ার অধরোষ্ঠের স্বাদ নিতে গিয়ে উন্মুখ তার ঠোঁট দুটি প্রায় কেঁদে ফেলেছিল বল্লেই হয়। ভদ্র মহিলার নাকি 'পাইয়োরিয়া' জাতীয় কোন অসুখ ছিল যাতে মুখটি মোটেই সুরভিত থাকতো না। এক মুহূর্ত্তেই ভদ্রলোকের প্রেমস্বপ্ন ভেঙ্গে খান্ খান্ হ'য়ে পড়ে। এ থেকেই বোঝা যায় কত সামান্য দৈহিক খুঁটিনাটির ওপর প্রেমের শিশ্‌মহল গড়া একটু ত্রুটিতেই তা ভেঙ্গে চুর হয়ে পড়ে।



'পাইয়োরিয়ার 'পিট্‌ফল'

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম—

মরকত আর হেমের উপমাই সুন্দর। দেহ নিয়ে এই সব কবিদের বাড়াবাড়ির আর অন্ত নেই।

আবার পরের যুগের কবি বলেছেন—

ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা—
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

কুড়ি বছরের এক তরুণ যখন বিবাহের হাত ধ'রে প্রেমের দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়ায় স্বপ্নভরা চোখ নিয়ে—তাদের তখন যাত্রা শুরু।

বিবাহের অভিজ্ঞতা এসে ক্রমশই তাদের কানে কানে বলে…প্রেমের মিটমিটে আলোককে তোমাদের পথপ্রদর্শক করে চোলো না হে—একটু পরেই ত ও আলো নিভে যেতে পারে। প্রেমের উচ্ছ্বাস কয়দিনই বা টিকবে বাস্তবের ধাক্কা খেয়ে ?

ক্রমে সত্যই তাই হ'য়ে দাঁড়ায়—বুবু তখন আর টুটুলের আগমন প্রতীক্ষায় দরজার কপাটটি ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে না। টুটুলও আর বুবুর চুলের কাঁটাটি নিয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মত কাব্য রচনা করে না।

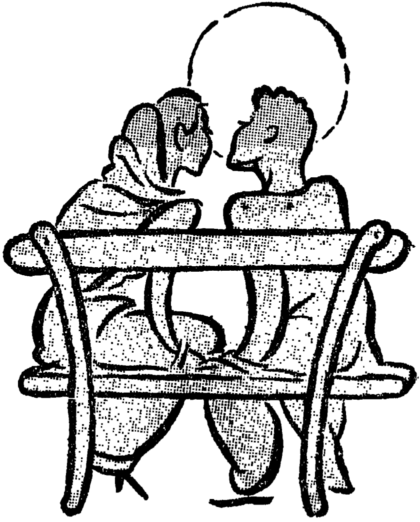
অথচ এরা বিয়ে করার আগে কত কি ভাবতো—কি ভাবে জীবন কাটাবে…বসন্তের ফুলগুলি কেমন ক'রে চয়ন ক'রে জীবনের সাজি

ভরাবে। বিয়ের পরেও তাদের কল্পনা ছুটতো দূরে—ছবির পর ছবি রচনা ক'রে।

এরা ভেবে রেখেছে তাদের পঞ্চান্ন বছর বয়স যখন হবে তখনও তাদের দাম্পত্য প্রেম এম্নি উদ্‌ভ্রান্ত হয়েই থাকবে। এম্নি পাগলের মতই তারা পরস্পরকে চাইবে। বিবাহ এম্নি মর্ম্মান্তিক যাতনাই পাবে বরাবর। কিন্তু হায়, বাস্তব এসে যাদুকরের মত অন্যরূপ খেলা দেখায়। একটি একটি মাস একটি একটি বছরের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের আকর্ষণের রহস্যটুকু কমতে থাকে। শেষে রাগে এবং হতাশায় এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

একটা কথা আছে "প্রেমের জন্য যারা বিবাহ করে তাদের মনে লুকানো দুর্ব্বলতা আছে"। এখানে এই তারুণ্যের প্রেমের কথাই বলা হয়েছে।

তারুণ্য যতই কমতে থাকে লজ্জা ততই কমে এবং ভালবাসার শক্তিও কমতে থাকে। বাড়ে হিসাব করার প্রবৃত্তি, কমে দুঃসাহস।



অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী

দোঁহে মোরা রব চাহি
অপার তিমিরে আর কোথা কিছু নাহি
শুধু মোর করে তব করতলখানি
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জন প্রাণী
অসীম নির্জ্জনে—

জ্যোৎস্না-ধোওয়া বিজনে ব'সে তরুণ তরুণী এই কবিতা আবৃত্তি ক'রে আনন্দ পায়। এই রকম হাজারো গান হাজারো গাথা তাদের কণ্ঠে

ফুঠে ওঠে। কিন্তু আধা বয়েসীরা বা বৃদ্ধেরা এই নির্জনে বসলে তাদের যে কবিতা পাবে না এটা হলফ্ করেই বলা যায়। তারা হয়ত মশার ওপর অভিযোগ করবে বা ঠাণ্ডা লাগার আতঙ্কে পালিয়ে আসবে এবং কম্‌ফর্টার আনতে মনে করিয়ে দেয়নি ব'লে গৃহিনীকে বেশ তিরস্কার শুনতে হবে।

স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা আর পরকীয়া প্রেমের বেশ একটি পূর্ণ ছবি পাই আমরা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতায়।'

অমিত বলছে—কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসবারই কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল। প্রতিদিন তুলবো প্রতিদিন ব্যবহার করবো। লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে রইল দীঘি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।

স্বামী স্ত্রীর প্রেমের মধ্যে ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতা যখন কেটে যায় তখন আর সেথা যৌবনের প্লাবন থাকে না, থাকে কিন্তু নিত্যকার জীবনকে সেবায় সোহাগে রসে পরিপূর্ণ করবার সঞ্জীবিত করবার সুদীর্ঘ অবসর।

এই প্রেমকে অমলিন ও অটুট রাখতে রবীন্দ্রনাথ কত উপায় উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন। অমিত আর বন্যার বাড়ী কেমন হবে? দুজনের দুটি আলাদা বাড়ী মাঝে নদীর ব্যবধান। দুজনে থাকবে কি ভাবে? দুজনের দেখা হবে মাঝে মাঝে, কখনও নিমন্ত্রণে কখনও অপ্রত্যাশিতভাবে। 'মিতালি' নৌকা বেয়ে চলবে যাতায়াত—দুজনের পোষাক ব্যবহার জীবনযাত্রায় কত বৈচিত্র্য তাঁর কবি কল্পনায় এসেছে। তারপর জীবনযাত্রাকে আরও সঙ্কুচিত ক'রে তিনি এনেছেন একটিমাত্র ঘরে—দুদিকে দুখানি খাট মাঝে এক আলমারির ব্যবধান, তাতে বই ঠাসা......

প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ব্যবধান যে দরকার এটা কবি কল্পনা নয় এটা বাস্তব সত্য। ঘেঁষা ঘেঁষিতে প্রেম যায় মরে। আকর্ষণ লুপ্ত হ'লে জীবনে রঙ যায় মুছে, পুলক যায় ধুয়ে।

একজন ইংরাজ লেখক স্ত্রীকে ক্যানেস্তারার সঙ্গে তুলনা করেছেন—

জিনিষপত্র রাখার দিক থেকে র‍্যাক কিম্বা আলমারির সঙ্গে তুলনা করলে আরও ভাল হ'ত।

রসিকতা ক'রে গুপ্ত কবি আবার বলেছিলেন—

শয্যায় ভার্য্যার প্রায় ছারপোকা ওঠে গায়
প্রতিক্ষণে চায় আলিঙ্গন।

কোন স্ত্রী-কবি এর প্রতিবাদ ক'রে কিছু লিখেছেন কিনা জানি না তবে ভার্য্যা সম্প্রদায় এ হেন কাব্য শুনে যে ক্ষিপ্তা হ'য়ে উঠবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আচ্ছা অনেকক্ষণ আমরা আমাদের পরিচিত সেই যুগলের কোন খবর নিই নি। চলুন না দেখে আসা যাক্—

কই এইখানেই ত তারা থাকতো—আমরা পূর্ব্বে আর একদিন রাত্রে তাদের কথা শুনেছিলাম। সতীশ রাণীর কাউকেই ত দেখছি না! তারা কি এ বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে? কে জানে—কিন্তু এখানে এরা কারা? কথাবার্ত্তা থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে কি? শুনুন ত ভাল ক'রে...এরাও ত স্বামী স্ত্রী, তবে কিছু বেশীদিন হ'ল বিয়ে হয়েছে মনে হয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার সুর যেন কেটে গেছে...কোথায় কি বেতালা একটা বিপর্য্যয় এসে জুটেছে মনে হচ্ছে। চুপ্, শুনুন......

স্ত্রী—সারাদিন তোমার একটু সময় হয় না ছেলেটাকে একটু পড়াতে বসাতে? মেয়েটার জন্যে কবে থেকে বলছি একটা ছোট হার-মনিয়ম আনতে। সংসারের কোন জিনিষ কি......

স্বামী—আমার দ্বারা হয় না—এই ত? কে করে শুনি? ওপাড়ার হরি ঘোষ এসে সব কচ্ছে, না?

স্ত্রী—শুধু টাকা এনে দিয়েই খালাস বুঝি? বাঃ··· সেত সবাই আনে মুচি মেথরও আনে, তাদের ঘরেও স্ত্রী আছে। এদিকে আমি প্রাতঃকাল থেকে উঠে কি না কচ্ছি······দুটি খেয়ে ত বেরিয়ে যাও কিন্তু কোথা থেকে কি হয় কটা খবর রাখ?

স্বামী—রাত্তির বেলা তোমার ফর্দ্দ রাখ—তোমায় হাত জোড় কচ্ছি

স্ত্রী—কেন রাখবো কেন শুনি? তোমার শোনার সময় কখনই বা আছে? বলি আমারই বা কি এত? চোর দায়ে ধরা পড়েছি কি আমি? এই সংসারে এসে সব গেল আমার......কি কুক্ষণেই যে ঢুকেছিলাম এই বাড়ীতে......আমার হাড়মাস ঝালাপালা হয়ে গেল। (কিছুক্ষণ চুপচাপ) রাতটা একটু বড় হোক ওকে নিয়ে যেদিকে দুচক্ষু যায় চলে যাব —

(আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ) চুপ ক'রে থাকলেই যেন সব হ'য়ে গেল— মর বাঁদি তুই ব'কে! এতগুলো কথা বললুম যে কানে যাচ্ছে? আমি আর এরকম ক'রে পারবো না তা আমি বলে দিচ্ছি......বলি শুনছো?

দিনকতক ন'দির ওখানে ফতেপুর গিয়ে আমি থাকতে চাই...... সেখানে চিঠিটা দিয়েছ? কি ঘুমুলে নাকি?

সত্যই হয়ত স্বামী বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছে কিম্বা শান্তির আশায় মুখে তালাবন্ধ করেছে।

চলুন এখান থেকে স'রে পড়া যাক। স্ত্রীর ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত মন বিদ্রোহ শুরু করেছে হেথা।

এইদিক দিয়ে যাওয়া যাক......টর্চ্চটা জ্বালুন। অন্ধকারে পথ ঠিক করা এক সমস্যা। হ্যাঁ—এই যে......

ওহো আমরা ভুল করেছিলাম, আমাদের সতীশ আর রাণীর ঘর ত এইটা। কি ভুলটাই যে করলাম—এতক্ষণ শুধু সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কি? এখনও শোওনি তোমরা? আশ্চর্য্য, রাত্রি ত অনেক হয়েছে!

ঐত রাণী খাটের ওপরে না? বাঃ বাঃ বাঃ বেশ মানিয়েছে ত। চুলটি পরিষ্কার ক'রে বাঁধা, একখানি রঙ্গীন কাপড় চমৎকার ক'রে পরা, কপালে আবার একটি টিপ—মুখে বেশ মিষ্টি হাসি। রাণীর মতই মানাচ্ছে বটে তোমায়!

সতীশ বইখানা মুড়ে এলিয়ে দিল দেহটা সেই শয্যাতেই। মাথা ধরেছে ব'লে অনুযোগ জানায় সে।



রাণীর মতই বটে

রাণী এসে ক্ষিপ্র হাতে কপালে তার ঠাণ্ডা আঙ্গুলগুলি ছোঁওয়ায়। হারমনিয়মের পর্দ্দায় যেন আঙ্গুল বুলোচ্ছে। আস্তে আস্তে বলে—মনে মনে বইটাকে যা গালাগালি দিচ্ছিলাম এতক্ষণ।

—কেন বলত ?

—ও যে আমার সতীন !

সতীশ হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

অর্গানের পর্দ্দা টেপার সোমে এসে রাণী যেন হাঁফিয়ে যায়, বলে—হাত ব্যথা করে।

সতীশ ওঠে, তার হাতটি নিয়ে আঙ্গুলগুলি টেনে মুচড়ে ঘুরিয়ে জড়িয়ে নানাভাবে আরাম দেবার চেষ্টা করে। রাণী চোখটি বুজে শুয়ে। মাঝে উঁহুঃ করে একবার মৃদু আপত্তি করে।

সতীশ আলোটা আরও ডিম করে দেয়। আঙ্গুলগুলি ছেড়ে এবার সে রাণীর সমস্ত হাতটিই নিয়েছে তার হাতে। ক্রমে নিলর্জ্জ হাতটা আরও ওপরে ওঠে—আরও এগিয়ে যায়।

সতীশের মনে আসে কত কথা কত গান, বাজে বকে যায় খানিক, দু'এক লাইন গানও গেয়ে ফেলে—প্রেমের গল্প বলে রাণীর কাছে মুখ নীচু ক'রে।

রাণীর চক্‌চকে ঠোঁটদুটো এগিয়ে যায় ঊর্দ্ধে—

গলার ওপর সরু চিক্‌চিকে হারটা নিয়ে সতীশের খেলা শুরু হয়। বুকের ওপর সবটা তুলিয়ে সে দেখবেই......কি জিদ যে তার! সতীশের দুষ্টু হাতখানা যেন ভবঘুরের মত বেড়াতে থাকে—তার যেন তৃপ্তি নেই। মুখে সে কত প্রলাপ ব'কে যায়—কত অর্থহীন ছেলেমানুষী দুজনেই করতে থাকে যে।

কোন্ আবেগময় মুহূর্ত্তে রাণী সতীশকে বাহুপাশে বেঁধে ফেলেছে। অতি লজ্জাশীলা সে কিন্তু স্বামীর শয্যায় সে লজ্জা থাকলে চলবে কেন?

কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ
দুঁহু তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ।

নীরবে শান্তির কোলে তাদের রেখে চলুন আমরা চলি। সতীশ ও রাণী জানে স্বামী স্ত্রীর আনন্দময় কর্ত্তব্যগুলি। ওদের প্রণয় আরও মজবুত হোক। এই মিলনের আনন্দের কাছে সংসারের সহস্র খুঁটি-নাটি, সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ডুবে যাবে।







সকলি গরল ভেল!

অমিয় সাগরে সিনান ক'রতে এসে সকলি গরল হ'য়ে দাঁড়ায়। দাম্পত্য জীবনে সুখের সন্ধানেই আসে সব কিন্তু কে হলফ ক'রে বলবে যে সে গরলের ছোঁয়াচ মোটেই পায় নি?

সুখ জিনিষটা কি? উত্তর দেওয়া মুস্কিল—তবে সবাই একে পাবার জন্যে ছুট্‌ছে, অবিরাম তার গতি—চেষ্টা না থাকলেও আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। নেশায় মানুষ বাঁচে, সুখের আশায় মানুষ প্রাণ দেয়। আপনি সুখী মানুষের সন্ধান করে দেখবেন—একটিও পাবেন না।


নিজেকে সুখী মনে করে কজন ?

সুখ জীবনে আসে বটে কিন্তু মজা এই যে কেউই মনে করে না যে সে সুখী—এমনই অজ্ঞাতসারে সে এসে হাজির হয়। সে যেন এক বনদেবীর মত, কর্ম্মরত মানুষটির মাথায় তার অজ্ঞাতসারে একটি স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে লোকটি তাকিয়ে দেখতে যায় কে দিল সেই মুকুট অমনি বনদেবীও নেই মুকুটও নেই—যেন ভোজবাজী।

আপনি খোঁজ ক'রে সুখী লোক একটি বার করুন তারপর জিজ্ঞাসা করুন তাকে—উত্তরে শুনবেন সবই তার আছে কিন্তু একমাত্র জিনিষ যেটি তার নেই সেটি হচ্ছে সুখ। 'ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি' দেবীর কাছে মানুষের সাধারণ একটি প্রার্থনা; কিন্তু মনোরমা ভার্য্যা পেয়েও কত লোককে দুঃখে দিন কাটাতে হয়েছে এবং ভার্য্যার মন পাওয়ার জন্যে দেবীর শরণাপন্ন হতে হয়েছে। সুখ ছোটখাটো আরামের মতই চেষ্টা ও যত্নে মেলে। এর জন্যে নিজেদের তৈরী হ'তে হয়। পূর্ব্বেই আমরা দেখেছি মনে 'রোমান্টিক' স্বপ্ন নিয়ে বিবাহ ক'রে হত-পুলক হ'য়ে মুষড়ে পড়া কোন মতেই উচিত নয়। কি-হ'তে-পারতো আর তা-হ'লো-না এধরণের চিন্তা মনে ঠাঁই দেওয়া উচিত নয়। ধরুন স্ত্রী শিক্ষিতা হ'লে ভাল হ'ত কিন্তু তা যখন হয়নি তখন অল্প শিক্ষিতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। স্ত্রীদের তরফ থেকেও তাই। গরীব স্বামীর ঘরে এসে স্ত্রীর মনের ফর্দ্দগুলির অনেক কাটছাঁট দরকার। সেখানে দারিদ্র্যকে মেনে নিলেই তবে শান্তি আসবে। আকাশ-কুসুমের দিকে তাকিয়ে চললে মাটিতে হোঁচট লাগা স্বাভাবিক। প্রকৃতি বাস্তব পথ ধরেই চলে।


ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি

ধরুন একটি কল্পনা-প্রবণ ছেলে বিবাহের অপার্থিব যত স্বপ্নে মসগুল

থাকতো—বিবাহকে নিংড়ে নিতে চাইল সে কোনদিকে কার্পণ্য না ক'রে। বেহিসেবী অজস্র অর্থব্যয়ে দেউলে হ'য়ে প'ড়লো শেষে। বাস্তবের সঙ্গে ধাক্কা লাগল তখনই যখন পাওনাদারের তাগাদার সম্মুখীন হ'তে হয় তাকে। পাওনাদারের 'বিল' হাজির হয় আর দাম্পত্যজীবনে হাহাকার উঠতে থাকে। এদিকে হয়ত দু'একটি অপত্যরত্নও এসে হাজির হয়েছে। সুখের অভাবে বিবাহে তখন আসে অশ্রদ্ধা—সংসারে বেহিসেবী হওয়ার খেসারৎ এই ভাবেই দিতে হয় তাকে।

হিসেবী হওয়াও আর একদিকে খারাপ। অতিমাত্রায় হিসেবী সংসারে এমন আছে—খতিয়েই শুধু কাটায় তারা, সুখ আর পায় না। এক তরুণ দম্পতি সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে কিন্তু অতি হিসেবী তারা, অর্থ সঞ্চয়ের দিকেই লক্ষ্য তাদের। হিসেবীয়ানা কার্পণ্যের কোটায় গিয়ে হাজির হয়। সিনেমা দেখার আনন্দটা হয়ত দুজনেই পেতে চায়। তাদের বাজেটে এটুকু ছাড়পত্র পেয়েছে কিন্তু দেড়মাইল পথ দুজনেই হাঁটতে আরম্ভ করে কোন যান-বাহনকে অস্বীকার করেই। অনভ্যস্ত পায়ে হাঁটার শেষে যখন তারা পৌঁছুলো সিনেমায়—ছবি হয়ত তখন ছ'আনা ভাগ হয়ে গেছে। হিসেবের খাতায় লোকসানই পড়লো তাদের ভাগে।


ছি ছি ছি ও আবার রং একটা!

পূর্ব্বে বলা হয়েছে সন্দেহ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। দুজনের কেউ কাউকেই সন্দেহ করবে না। স্ত্রীকে স্বামী তার সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-জীবনের অঙ্গ হিসেবেই গ্রহণ করবে। তাকে বাদ দিয়ে যেন তার কোন পরিকল্পনাই না থাকে। স্বামীকেও সেইমত গ্রহণ করবে স্ত্রী। সুখের আদর্শ দুজনেরই এক

রকম হওয়া দরকার অবশ্য যতটা সম্ভব। দুজনের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও রুচি যতটা সম্ভব একমুখী হওয়াই বাঞ্ছনীয়—স্বামী গোলাপী রংএর পক্ষপাতী কিন্তু স্ত্রী যদি গোলাপীর ওপর একান্ত বিরূপ হয় তাহ'লে ভাবুন এক রং নিয়েই বাড়ীতে কি অশান্তি বাধতে পারে। ছোট-খাটো খুঁটিনাটি এরকম কত বিষয়ে ঘটতে পারে—আচারে বিচারে শয়নে ভোজনে......স্বামী প্রচুর ঝাল খায়, স্ত্রী ঝালের নামে জ্বলে ওঠে। স্ত্রী আবার টকে আসক্তা, অম্বল কাসুন্দির নামে উল্লসিত হয় কিন্তু স্বামীর কাছে টক হাজির করার উপায় নেই। টক হয়ত তার কাছে শত্রু বিশেষ।

রুচিতে সামঞ্জস্য চাই—যেখানে সামঞ্জস্য সম্ভব নয় সেখানে দরকার অপরের মত ও রুচিকে মেনে নেওয়া ও সহ্য করা। ধরুন বিয়ের আগে স্ত্রী প্রচণ্ড সঙ্গীতানুরাগিণী ছিলেন—স্বামী আবার দাবা-খেলা প্রিয়। বিবাহের পরে দুজনের আসক্তি একেবারে লুপ্ত হ'তে পারে না—থেকেই গেল, স্ত্রী সঙ্গীত চর্চ্চা করেন স্বামী খেলা নিয়ে মত্ত থাকেন। কিন্তু দাবায় অসহিষ্ণু হ'য়ে স্ত্রী যদি কোন কাণ্ড বাধিয়ে বসেন, সঙ্গীতে অসহিষ্ণু স্বামীর পক্ষেও কিছু বাধিয়ে বসা অসম্ভব নয়। তাহলেই দাম্পত্যজীবনে কালো এক পর্দ্দা নেমে আসে।

একটা জিনিয যা নিয়ে সচরাচর গণ্ডগোল বাধে তা হচ্ছে—অর্থঘটিত ব্যাপার। আমাদের সমাজে প্রায় সব সংসারেই টাকা উপার্জ্জন করে স্বামী, উপার্জ্জন-রতা স্ত্রী সংখ্যায় কমই। পাওনাদারদের বিল প্রায় সব স্বামীর সুখস্বপ্ন ছুটিয়ে দেয়। স্ত্রীর নিজে খরচ পত্র করার একটা প্রবৃত্তি আছে। স্বামীর প্রকৃত সঙ্গতি না বুঝেই হয়ত স্ত্রী খরচ করে বসলো—তার সমগোত্রীয়দের কাছে হয়ত তার মর্যাদা বাড়লো কিন্তু স্বামীর বুকে হয়ত তা খচ্ করে বেঁধে। কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয়, তার কাছে অপব্যয়ই বলতে হবে এটা, সে সইতে পারে না। স্ত্রীরা কুমারী-কাল থেকে স্বামীর অর্থের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকটা অধিকার বোধের আনন্দ পায় যেন তারা স্বামীর অর্থে।

অনেকে বলেন স্ত্রীরা পুরুষের চেয়ে বেশী হিসেবী। সংসারের বাস্তব

দিকটায় তারা বেশী পোক্ত। স্বামী অনেক সময় ভাববিলাসী ও ভাবপ্রবণ হবার দিকে ঝোঁক দিতে পারে। স্ত্রীর সাথে প্রেমগুঞ্জনে হয়ত বেশী সময়ই কাটিয়ে দিলে সে। কিম্বা কোন প্রণয়-মধুর গল্প বা কাব্য নিয়ে স্ত্রীকে শোনাতে লেগে যায় সে। অফিস হয়ত কামাই ক'রে ফেলে। ক্রমাগত অবহেলায় চাকরী রাখাই দায় হয়ে ওঠে শেষে তার। এই সব ব্যাপারে স্ত্রীর প্রতিবাদ কিন্তু সব চেয়ে প্রখর হয়ে উঠবে, সে কোন মতেই এই কুড়েমিকে প্রশ্রয় দেবে না। বরং সে স্বামীর বিরহ সহ্য করবে সেও ভাল, সে মন দিয়ে চাকরী করুক এইটা স্ত্রী চায়। সপ্তাহান্তে একবার দেখা পেতেও স্ত্রীরা প্রস্তুত যদি মাসের শেষে স্বামীরা মাইনেটি এনে তাদের করকমলে অর্পণ ক'রে দেয়।



মাসের শেষে টাকাটা এনে দেয়

আনন্দের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে স্বামী স্ত্রী যেন জড়িত থাকে। একজনের আনন্দের শুভমুহূর্ত্তে অপরের বাদ থাকলে চলবে না, দুজনেরই সমান অংশ থাকা চাই।

কেউ বলবে এদিকেও কিছু বিপদ আছে। ধরুন স্বামী স্ত্রীকে বাদ দিয়ে কিছুই করে না—ছোটখাটো থেকে সবরকমের আনন্দ অনুষ্ঠানে স্ত্রীকে যথাযোগ্য অংশই সে দেয়। অংশ কেন স্ত্রীর যোগ দেওয়ার ওপর নির্ভর করে সব। এমত স্থলে স্ত্রীর মনে একটা ফাঁকা অহং-বোধ জাগা স্বাভাবিক যেহেতু স্বামীর সর্ব্বসুখের চাবিকাঠি যেন তারই হাতে। এই নিয়ে স্বামীকে সময়ে সময়ে বিপর্য্যস্ত করতেও পারে সে।

অসম্ভব নয়, তবে স্বার্থপর প্রকৃতির মেয়ের দ্বারাই এরকম হওয়া সম্ভব। অনেকে কিন্তু স্বামী সংযোগে কাজ করার ও আনন্দ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তোলার পথ পাবে। এবং নিজের ওপর বিশ্বাস আসবে নিজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে।



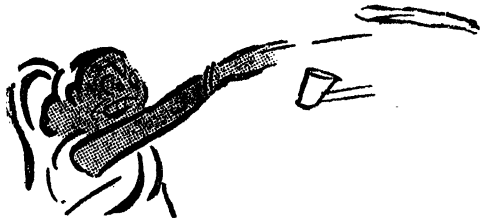
ছোট মেয়ে—আচ্ছা মা এত লোক থাকতে বাবার সঙ্গেই বা তোমার বিয়ে হ'ল কেন ?
মা—দেখছিস ত, আজ তুই পর্য্যন্ত অবাক হয়ে যাচ্ছিস !

আমাদের দেশের আগে আদর্শ ছিল পরকালের সুখ সঞ্চয়ের জন্যেই ইহকাল। ইহকালের আর কোন দামই নেই। এই ধারণা এখন বদলে গেছে। আমরা বোধ হয় একটু ভাল ক'রে বাঁচতে শিখছি—বর্ত্তমান জীবনযাত্রাকে হেলাফেলা না ক'রে। ওদেশে জীবনযাপনকেও একটা আর্ট বলেছে। আমারও তাই মনে হয় জীবনের শুকনো মালমশলাগুলো নিংড়ে রস বার করতে হলে কৌশলের প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনে এই কৌশলের বা আর্টের প্রয়োজন আরও বেশী।

সংসার যাত্রা সবাই নির্ব্বাহ করে কিন্তু সকলের সংসারে আপনি শ্রী দেখতে পাবেন না। যে সংসারে শ্রী ফুটে ওঠে না সেখানে সুখের মুখ দেখবেন কি ক'রে? সংসার যেন দম্পতিযুগলের আয়না। তাদের সম্পর্কের প্রতিচ্ছবিটি দেখা যায় এর মধ্যে।

একটি সংসারে যদি দেখেন সব ছত্রভঙ্গ, বুঝতে হবে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক শিথিল, যথেচ্ছাচারই সেথা বড়, সুখের নাম গন্ধও নেই সেথা।

আবার আর এক জায়গায় দেখুন—দরিদ্রের সংসার কিন্তু ঘরের এক প্রান্তে একটি গ্লাসে কয়েকগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ঘরের একপাশে শয্যাটি পরিপাটি ক'রে গুছানো। জানলায় রঙীন কাপড়ের এক ফালি পর্দ্দা। থালাঘটি বাসন থেকে আরম্ভ ক'রে কাপড় চোপড়

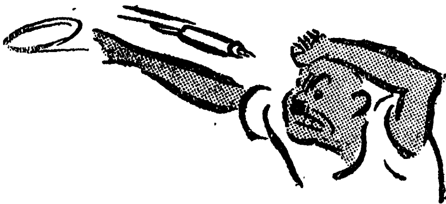


রণপর্ব্ব

বাক্স তোরঙ্গ চমৎকার সাজানো। স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় স্ত্রী একটি লালপেড়ে সাড়ী পরে খাবার তৈরী করছে! মুখে তার শান্তির এক ঝলক আলো। দেখেই মনে হবে স্বামী স্ত্রী দু'জনের মনের তার গুলি যেন একই সুরে বাঁধা।

এই সূত্রে এক পরিচিত দম্পতির কথা মনে পড়লো। পাড়ার লোক বলে তাদের মুখের শ্রীবচনের দাপটে নাকি কাক চিল তাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না। দু'জনের কেউই কম যায় না ঝগড়ায়—শুধু মুখ কেন থালা ঘটি থেকে আরম্ভ ক'রে বেলন চ্যালাকাঠ ছোঁড়া-ছুঁড়িও চলে। প্রতিবেশী সবাই প্রায় আশঙ্কা করে কখন কে খুন জখম-হয়। একদিন এক বিরাট অগ্ন্যুৎপাত ঘটে গেল, প্রতিবেশী সবাই সন্ত্রস্ত! আরও ভয়ের কারণ ঘটলো—যখন অগ্নিস্রাবের পর অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। সাড়া শব্দ না পেয়ে লোকে ভাবলো শাণিত বটীতে কিম্বা ক্ষুরধার কাটারিতে নিশ্চয়ই দু'জনে জখম হয়েছে। পুলিশের কাছেও খবর গেল--তারপর সপুলিশ তারা উঁকি দিয়ে দেখলো আশ্চর্য্য এক দৃশ্য! স্বামী স্ত্রী দু'জনে পাশাপাশি বসে একটি থালা থেকে তৈল-চর্চিত মুড়ি সেবন করছে। মুখে বিরোধের ছায়ামাত্র নেই। পরে এদেরই 'কনফেশনে' (স্বীকারোক্তি) শুনেছিলাম—এরা ঝগড়ার পরে মিটমাটের আনন্দটা উপভোগ করতেই নাকি ঐ তুমুল ঝগড়ার সৃষ্টি করে।

কবি শেলী গেয়ে গেছেন 'বেদনার পরে যে আনন্দ আসে সেটিই বেশী মধুর।' কষ্ট ও সুখ দিন ও রাত্রির মত পর পর আসে। সুখ পেতে হ'লে কষ্ট করতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভব নয়। এমন কি সৌভাগ্যের আশীর্বাদ-পুষ্ট যে ধনীর দুলাল তার কাছে নিরবচ্ছিন্ন সুখও কষ্টকর বোধ হয়। নিশ্চিন্ত আরামে যাদের

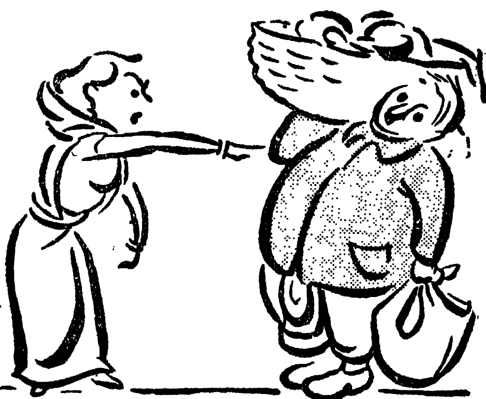


দুজনের কেউই কম যায় না

দিনের পর দিন কাটে তাদের আরাম বোধ একেবারেই ভোঁতা হ'য়ে যায়। সুখ আর তখন থাকে না।

পরিশ্রমের পর বিশ্রাম আরামের। তাই পরিশ্রম দিয়ে বিশ্রাম কিনতে হয়। বিরহ দিয়ে মিলনকেও। অভাবের পর স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ মধুর।

একটা না হ'লে অপরটির অস্তিত্ব থাকে না। যে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে কখনও বিচ্ছেদ হয়নি তাদের মিলনও যে বিস্বাদ হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক। পঁচিশ বছর দাম্পত্যজীবনের পর নীলকান্তদা একটি দিন সত্যিকার সুখের নাকি মুখ দেখেছিলেন। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—ভায়া, উপনয়নের পর পৈতে যেমন ব্রাহ্মণের গলায় ওঠে আর নামে না স্ত্রীও আমার বিয়ের পর যে সংসারের রথে চড়েছেন আর নামেন নি। তাঁর সাহচর্য্য এমনই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যে সে যে আছে এটাই ভুলে গিছলাম। সহজে স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ করা আমার ধাতে আসতো না কিন্তু একদিন গিন্নী আমায় না জানিয়ে এমন এক কাজ করলো যে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুল না। যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলাম ফুলতে ফুলতে। বাড়ীতে যখন ফিরি তখনও রাগ মরেনি কিন্তু রাগ যার পরে সে কোথা—বাড়ী ত একেবারে ফাঁকা, যেন খাঁ খাঁ করছে। কোথায় গেল? যাক, যে চুলোয় হোক—ব'লে তিন দিন জেদ ক'রে রইলাম। ঘর যেন শ্মশান-চারী শিবের আশ্রম



অনেক সময় কথার বাধ্য হওয়াই ভাল

হ'য়ে দাঁড়ালো। তারপর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গলো, এই আধা বয়েসেই চললাম শ্বশুরবাড়ীর পথে—দেখি শ্যালকের সঙ্গে গৃহিনী সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। ইচ্ছে হ'ল কেঁদে ফেলি! সামলে নিলাম...শ্যালকের অনুরোধে আমাকেও সঙ্গ নিতে হ'ল। ভরা মন নিয়ে গুম হ'য়ে ব'সে সারাক্ষণ কাটলো। সে রাত্রি শ্বশুরালয়েই অবস্থান। কিন্তু সে রাত্রিটার কথা ভুলবো না। স্ত্রীর মান ভাঙ্গলো দেরীতে, আমার পরাজয় ত আগেই হয়েছিল...মান অভিমান ভুলে গিয়ে আমি যেন স্বর্গ পেয়েছি মনে হ'ল। পরদিন আবার আমার সংসারের অনড় রথে সারথি সংযোগ হ'ল।

সুখ নানা লোকের কাছে নানা রকমে হাজির হয়। আসল কথা কোন জিনিষে বা কোনও ঘটনায় সুখ বাস করে না—সুখের সত্যকার আস্তানা আমাদের মনে। মনের সামান্য একটি ঝোঁকের জন্যেই হয়ত আপনাকে ঘোরতর অসুখী হ'তে হয়েছে।

একটি রাত্রের কথা ভেবে দেখুন—হয়ত আপনি সন্ধ্যায় বের হলেন; ফিরতে দেরী হবে ব'লে নোটিশ দিয়ে দিলেন যে, রাত্রে আপনি খাবেন না—বিবাহের নিমন্ত্রণ আছে। বিয়ের আসর থেকে কোন দুর্ঘটনাবশতঃ আপনাকে ফিরতে হ'ল খালি পেট নিয়ে। বাড়ী এসে ঘুমন্ত স্ত্রীকে দেখেই বিশেষ ভাল লাগলো না—আপনার শোচনীয় ক্ষুধার কথা জানাতেও যেন সঙ্কোচ লাগে এ সময়ে, যখন সকলে খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে। স্ত্রী উঠে সব কথাই জিজ্ঞাসা করলো শুধু খাওয়ার কথা বাদ দিয়ে—এতে আপনার রাগ আরও বেড়ে যাবে, মনে যুক্তি আসবে—কেন? এ খোঁজটা কি নিতে নেই? মনে অশ্বস্তি নিয়ে আর পেটে দুরন্ত ক্ষুধা নিয়ে আপনি হয়ত কথাই বন্ধ ক'রে দিলেন এবং শয্যার একপ্রান্তে আড় হয়ে শুয়ে রইলেন—হয়ত সমস্ত রাত্রিই এভাবে কাটলো নিদারুণ যন্ত্রণায় শুধু মনের এক দুষ্টু ঝোঁকের বশে। কিন্তু এমনও হ'তে পারতো, হয়ত আপনার মুখে কিছুটা শুনেই বেচারার দুঃখের আর অন্ত থাকতো না এবং সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াবার আগ্রহে অস্থির হয়ে পড়তো।

কম বয়েসে দাম্পত্য মান অভিমান যেন প্রেমের দুই সেনাপতি। হৃদয় যখন পূর্ণ থাকে ছোট্ট খাটো ত্রুটি তখন মনের দরজায় প্রবেশ করবার অধিকার পায় না। মানুষটাই তখন বড় হ'য়ে থাকে তারপর আস্তে আস্তে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ছোট হ'তে থাকে, আচরণ বড় হয়। খাওয়ার শেষে পান দিতে ভুল হ'লে রাগ এসে যায়, যেন কোন অমার্জ্জনীয় ত্রুটি হয়ে গেছে। আগে হয়ত এটা ত্রুটিই মনে হ'ত না, বরং নিজে চেয়ে খাওয়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দ হ'ত।

আগে তরুণ জীবনে সগুবিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর ধ্যান ও জ্ঞানের সবখানি জুড়ে থাকে। ভালবাসার প্রথম অধ্যায়ে সে এমনি সর্ব্বগ্রাসী ভাবে দাম্পত্যজীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে! কত সামান্য জিনিষে কত সুখ—ছোট্ট একটি কথায়, ছোট্ট একটু হাসিতে, ছোট্ট একটু সেবায় কত আনন্দ! প্রিয়তমার সামান্য কোন কাজ ক'রে দিতে পারলে কত তৃপ্তি! তার ক্ষুদ্র কোন ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে কী সুখ—প্রতিদানের আশা তখন থাকে না—ছোট স্পানিয়েল কুকুরটির মত কাছে কাছে থেকে ছোট খাটো সেবার সবটুকু করার অধিকার পেলেই যেন জীবন সার্থক মনে হয়।

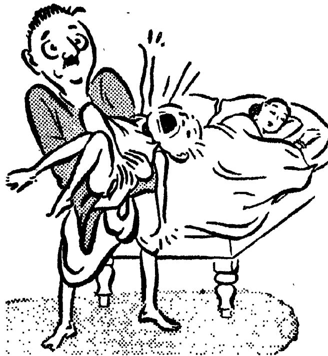


স্প্যানিয়েলটির মত বসে থাকে

তারপর জীবনে মধ্যাহ্নের খরতাপ যতই বাড়তে থাকে ততই ভালবাসা ফিকে হ'তে আরম্ভ করে, সুখের প্রস্রবণ আগে যেথা ছিল এখন আর সেথা নেই—কোথায় বহুদিন সরে গেছে। মরীচিকার মত সুখের সন্ধান চলে, রহস্যের যক্ষপুরীতে যেন 'সার্চ্চ ওরারেণ্ট' নিয়ে তোলপাড় চলতে থাকে। কিন্তু সুখের ঠুনকো স্বপ্নকে ধরা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ধরতে গেলে ভেঙ্গেই যায়—অর্থের চাকচিক্যে শুধু তার রংটা দেখা যায় মাত্র। নেশাটা থেকে যায় শুধু। দেনা পাওনার হিসাব চলতে থাকে।

এখনো পূর্ব্বের মত বহুদেশে পুরাণো আদর্শে বিয়ে চলছে। আর্থিক আশ্রয়, সন্তান পালন বা গতানুগতিক যৌনবৃত্তি চরিতার্থ ক'রতে বিবাহ ক্রিয়া চলে। সভ্যদেশে আজ এর ব্যতিক্রম শুরু হয়েছে। বিবাহে এসব ছাড়াও আরও অনেক জিনিষের স্থান আছে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও নিম্নস্তরের সুখ ছাড়াও বিবাহের একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য আজকাল সভ্য দেশে স্বীকৃত হচ্ছে। আত্মবিকাশের তাগিদ কিম্বা মানবস্বভাবে নিহিত কি যেন এক পরম পিপাসা যা নরনারীসঙ্গের মধ্যে তৃপ্ত হয় তার পরিপূর্ণ রূপই বিবাহ। বংশরক্ষা বা শারীর প্রয়োজন বিবাহের একটি অংশমাত্র একথা আজ সভ্য মানুষ বুঝতে শিখছে।

বিবাহে মানুষ কি চায় তা বোঝানো যায় না কারণ সে যা চায় তা অতি গভীরের পদার্থ—ভাষায় তার রূপ ধরা পড়েনি। পুরুষ প্রকৃতির মিলন ও লীলা সার্থক হয় বিবাহে।



বিবাহ 'ব্লাঙ্ক চেক' দিতে পারে না

আমরা সুখ বলতে সব চেয়ে যাকে কাম্য মনে করি, যার অদৃশ্য আকর্ষণে অমাদের ছুটোছুটির অন্ত নেই সেই পদার্থ বিবাহ থেকেই শুধু মেলে। বিবাহ যদি আদর্শ হয় তা দিয়ে আমরা পৃথিবীতেও স্বর্গ গড়তে পারি। অবশ্য স্বর্গ বলতে কেবল নিভেজাল সুখেরই রাজত্ব সে হবে তা আমি বলছি না কেননা বিবাহ এমন 'ব্লাঙ্ক চেক্' দিতে পারে না যা ভাঙ্গিয়ে শুধু অফুরন্ত খাঁটী সুখ পাওয়া যেতে পারে।

সুখ ও আনন্দ পাওয়া বেশীর ভাগ মানসিক গঠনের ওপর নির্ভর করে। একই অবস্থায় দু'জনকে যদি রাখা যায় দেখা যাবে একজন

সুখে আত্মহারা হয়েছে আর একজন হয়ত কষ্টে মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছে।

পৃথিবীকে কেউ কেউ জঘন্য জায়গা বলেই ধারণা করে নেয়। এখানে কষ্টভোগের জন্যেই মানুষের জীবন ইত্যাদি মুষড়ে-দেওয়ার মত মনোভাব অনেকেরই আছে। শোফেনহাওয়ার এই জাতীয় মতবাদের একজন স্রষ্টা।

আবার এর উল্টোও দেখা যাবে। যা-কিছু-সবই-ভালর-জন্য ইত্যাদি বিশ্বাস অনেকের আছে। দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে—ঘটনা হোক আর দুর্ঘটনাই হোক সবার মধ্যে করুণাময় পরমেশ্বরের সদয় হস্তক্ষেপ তাঁরা যেন প্রত্যক্ষ করছেন মনে হয়। দারুণ দুর্য্যোগেও তাঁরা কল্যাণকর কোন ইঙ্গিত আবিষ্কার করেন।

দুঃখবাদীর চেয়ে এ রকম সুখবাদীরা স্বভাবতঃ সুখী। আবার সুখ-বাদের চরমপন্থী যাঁরা তাঁরা রঙ্গীন চশমা দিয়ে দেখবার মত সমস্ত কিছু দেখেন বেশ একটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে।

মনে আছে এক ভদ্রলোকের কথা। একদিন তাঁর কাছে ব'সে আমরা গ্রীষ্মের সায়াহ্ন সময়টি জমিয়ে রেখেছি এমন সময় তাঁর এক আত্মীয় হঠাৎ হাজির। চোখে মুখে তাঁর উদ্বেগের ঘন ছাপ—যেন সদ্য বিপৎ-পাতে দুমড়ে-পড়া অবস্থা। আমরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লুম। তারপর তিনি যে কাহিনী বললেন তা এই—তাঁর দূরসম্পর্কীয়া শ্যালিকা চাঁপা বাপের একমাত্র কন্যা—অমিতাভ'র সঙ্গে তার বহুদিনের প্রণয়। গোপনে তারা যখন বিবাহের ঠিক ঠাক করছিল এমন সময় বাপের মাইকা মাইনের একটি জ্বলজ্বলে কর্ম্মচারী পতিতকে চাঁপার পাত্ররূপে বাপ স্থির করলেন এবং বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেল। বিবাহ রাত্রে অমিতাভ অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত এসে প'ড়ে পতিতকে গুলি করলো এবং চাঁপাকে নিয়ে পালাবে এমন সময় চাঁপার বাবা অমিতাভকে 'স্যুট' করে। অমিতাভ ধরাশায়ী হওয়ায় চাঁপা রিভলভারটা তুলে নিয়ে আত্মহত্যা করে—চাঁপার মৃত্যু সহ্য ক'রতে না পেরে তার বাপ দু'দিন পরে আজ সকালে হার্টফেল করেছে।

আমরা সবাই নির্ব্বাক নিস্পন্দ—যেন ডিটেক্‌টিভ ড্রামা শুনছি। আত্মীয়টি চুপ করতে ভদ্রলোক বেশ প্রফুল্লভাবেই বললেন—যাক্ যা হয়েছে তা ভালর জন্যই।

আমরা ত অবাক। জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলুম না—এর মধ্যে ভাল কি পেলেন ?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—চাঁপার বাপ আজ সকালে হার্টফেল করেছে এটা ঠিক ত ? আচ্ছা সে যদি গতকাল হার্টফেল করতো কিম্বা সেই বিয়ের রাত্রিতেও ত করতে পারতো। তাহ'লে আজ সকালে মরাটা কি তার চেয়ে ভাল হয় নি ?

উত্তর দেবার কিছু ছিল না।

বিবাহ ব্যাপারে দুঃখবাদী বা সুখবাদী কোনটা বেশী না হওয়াই ভাল। প্রত্যেক জিনিষকে তার নিজের মূল্য দিয়ে বিচার করা ভাল। অসুবিধাকে অসুবিধা হিসাবেই নেওয়া ভাল এবং তা দূর করতে সত্যিকার যত্নও দরকার। নিছক ভাল কিছু নেই নিছক মন্দও কিছু নেই।

এমন ঘটনা আজকাল মোটেই বিরল নয় যে, কোন স্ত্রী স্বামীর সঙ্গই ছেড়ে দিল ভাবপ্রবণ হয়ে কিম্বা স্বামী ছাড়লো স্ত্রীকে। ওদেশে এক মামলায় জানা গিয়েছিল, যে স্ত্রী সোজা স্বামীকে ত্যাগ করেই চলে এল অবলীলাক্রমে, কেন না স্বামী নাকি ঘুমুলে ভয়ানক নাক ডাকে। নাক ডাকার আওয়াজ সে বরদাস্ত করতে পারে না—কেমন করেই বা পারবে ? সে জোর গলাতেই আদালতে নাকি প্রমাণ করতে চাইলে যে স্বামীর নাকই তাকে তাড়ালো।

উত্তেজনা বা আবেগে ভর দিয়ে শূন্যমার্গে ওড়া খুবই খারাপ। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার ক'রে দেখলে অনেক জমাট জিনিষও হাল্কা হয়ে যায়। হিসেবী হওয়া বরং ভাল বেহিসেবী ভাবপ্রবণ হওয়ার থেকে। স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গসুখ প্রত্যেকেই যেন উপভোগ করে। সংসার যেন দুজনের 'পার্টনারশিপে' কারবার—এবং দরদ আর সহিষ্ণুতা যেন তার হয় মূলধন।



কুমার সম্ভব

অনেক দিন হ'ল আমাদের পূর্ব্বপরিচিত দম্পতিযুগলের কোন খবর নেওয়া হয় নি। সতীশ ও রাণীর বাড়ীর গার্হস্থ্য ছবি আমরা শেষ যা দেখে এসেছি সে বেশ আশাপ্রদই বলতে হবে। দু'জনের মধ্যে গভীর ভালবাসা যে আছে তাতে সন্দেহ নেই—একজন আর একজনকে বেশ ভালভাবেই চেনে তাই তাদের মধ্যে বিরোধ কম। আসুন না আজ আর একবার তাদের খোঁজ নেওয়া যাক।

বার-বাড়ীটি তারা বেশ সাজিয়েছে ত! তিনটি বছর ইতিমধ্যে

কেটে গেছে বেমালুম। ক্রোটন গাছগুলো নানা রংয়ের ছোপওয়ালা পাতা নিয়ে রোয়াকের পাশে উঠানের ধারে বেশ বাহার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রোয়াকে দাঁড়ালেই দেখা যাচ্ছে দালানের ভিতরের খানিকটা। ওহোঃ দালানে ঝুলছে ওটা কি? দোলা—হ্যাঁ তাই ত—তাহ'লে......কি?

সত্যিই তাই, ঐ যে, এ বাড়ীতে তৃতীয় একটি আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে। রাণীর কোলে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। ফুট্‌ফুটে একটি সুন্দর খোকা এতদিন পরে রাণীর কোল আলো ক'রে আছে। রাণী আজ পুত্রবতী, সোনার মত এক খোকার মা—মুখে যেন তার গর্ব্ব আর আনন্দের এক ঝলক আলো।

স্ত্রীর কাছে সন্তানের জন্মের মত প্রয়োজনীয় জিনিষ আর নেই। সে যেন বিবাহের পরই এই তপস্যায় সমাহিত থাকে। নারীর কাছে মাতৃত্ব একান্ত দরকার। পুরুষের কাছে এটি সময়ে সময়ে অনাবশ্যক বলেও মনে হয়। স্ত্রীর কাছে ষোল আনা প্রাপ্য আদায় হয় না বলেই ক্ষোভ থেকে হয়ত এই অনাসক্তির জন্ম কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী পিতৃত্বের নতুন অভিজ্ঞতা বেশ উপভোগ করে এবং একটি অসহায় শিশু নিয়ে খেলা করতে করতে যেন তার অভিভাবক সেজে বসে।

*　　*　　*　　*

সন্তানের জন্ম কেমন ক'রে হয়?

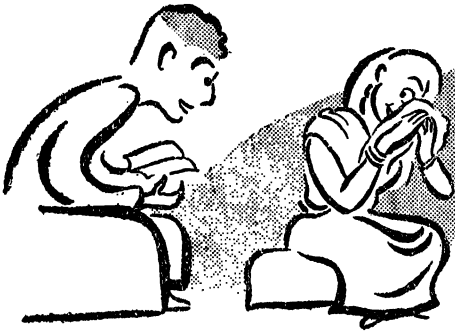
প্রকৃতির সে এক রহস্য! পুরুষ ও নারীর মিলনকে ভিত্তি ক'রে সন্তানের জন্ম হয় একথা সকলেই জানে। আজ বিজ্ঞানের আলোতে আমরা এই জন্মতত্ত্বের অনেক কথাই জানতে পেরেছি।

পুরুষের দেহজ শুক্রকীট নারীর ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয় এক বিচিত্র প্রক্রিয়ায়—তাই থেকেই ভ্রূণের উৎপত্তি। নরনারীর মিলনের আনন্দকে কেন্দ্র ক'রে প্রকৃতি জীববিজ্ঞানের বংশরক্ষা কাজটি কেমন করিয়ে নেয়—ভাবলে অবাক হ'তে হয়। জীবজগতের সর্বত্রই এই নীতি চলছে এমন কি উদ্ভিদের মধ্যেও সৃষ্টিতত্ত্বের এই গোড়ার কথা।

জন্মরহস্য নিয়ে এখানে আমরা অন্য আলোচনা একেবারেই করবো

না কেবল এইটুকুই বলবো যে, স্বামী ও স্ত্রীর কিছুটা জ্ঞান এ বিষয়ে থাকা দরকার। শুধু যে আসঙ্গ সুখের উপরি পাওনা হিসাবে পুত্র কন্যার জন্ম হয় এই ধারণাই অনেকের আছে। বিশেষ আমাদের দেশের মেয়েদের। পুরুষ জানলেও মেয়েদের জানাবার চেষ্টা করে না। দেহের ইন্দ্রিয়গুলির পরিচয় ও তাদের কাজ, তারপর গর্ভসঞ্চার বা ভ্রূণতত্ত্ব এ সব বিষয় মেয়েরা কেন জানবে না? অন্ধকারে কুসংস্কারে তারা কেন যে চোখ বুজে চলবে বুঝতে পারি না।

আমাদের শাস্ত্রে গর্ভাধান সম্বন্ধে অনেক নিয়মকানুন আছে। গর্ভাবস্থায় মেয়েদের অনেক কর্ত্তব্য আছে মেনে চলবার—এগুলি সংস্কারবশেই কিছু কিছু মেয়েরা মেনে চলে। বিজ্ঞানের আলো দিয়ে কেউ দেখে না—জানতে চায় না।


শুনতে ঘোরতর আপত্তি

আমার কাছে এক বন্ধু দুঃখ করেছিল এই ব'লে যে, তার স্ত্রীকে সে অনেক ক'রে রাজী করেছিল যৌন বিজ্ঞানের কিছুকিছু শোনাবে ব'লে। ভূমিকার পর যাই সে যৌন ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে সবে মাত্র সূচনা করেছে অমনি স্ত্রী চোখে মুখে কাপড় ঢেকে শুনতে ঘোরতর আপত্তি ক'রে বসলো। লজ্জা মেয়েদের অনেক সময় জ্ঞানের পথে মস্ত বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়।

সন্তানের জন্ম কেমন ক'রে হয় গর্ভধারিণীর এ বিষয়ে কিছু জানা দরকার। প্রত্যেক নারীর মধ্যে মা হবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে। কোন কোন স্ত্রী 'মা না হ'লে' জীবন ব্যর্থ হবে এই রকম ধারণা নিয়ে থাকে এবং যতদিন না সন্তানের জননী হবার সুযোগ পায়

ততদিন নিজেকে ঘোরতর অসুখী জ্ঞান করে। বন্ধ্যা নারীর জীবনে কদাচিৎ শান্তি মেলে।

মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের স্বাভাবিক। সৃষ্টি রক্ষার জন্যে এই তাগিদ প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আছে। বিবাহের মধ্যে এই প্রাকৃতিক বংশরক্ষার প্রেরণা বেশ সার্থক হয়েছে। এখন সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে—এটি বংশ রক্ষার বিপরীতধর্ম্ম—সৃষ্টিসঙ্কোচ বা 'বার্থকন্ট্রোল'। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে এই অভিযানটির সম্পর্কে অনেক তর্ক আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বহু বই, লেখা ও আলোচনা আজ পর্য্যন্ত হয়েছে যা থেকে এর গুণ ও ত্রুটি সুবিধা ও অসুবিধা জানা যেতে পারে। স্বামী স্ত্রীর পক্ষে এ বিষয়ে ভালরূপ জ্ঞান থাকলে ক্ষতি কি ?

কোন কোন মেয়ে বিবাহের পর থেকেই সন্তান জন্ম বিষয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে থাকে। গর্ভধারণ সম্বন্ধে তাদের একটা অস্পষ্ট ভুল ধারণা এবং অমূলক ভয় পোষা থাকে, তাই থেকে কিছুতেই ঐ অবস্থার সন্মুখীন হ'তে চায় না। স্বামীর উচিত একরকম স্ত্রীর মনের ভুল ধারণাগুলি শুধ্‌রে দেওয়া। হয়ত ছেলেবেলা থেকে কোন ভুল সংস্কার তার মনকে আশ্রয় করে থাকবে। অনেক সময় অনেক অসুখ—শারীরিক ও মানসিক দু'রকমই পেয়ে বসে যা ছেলেপুলে হবার পর বেশ সেরে যায়। হিষ্টিরিয়া, ফিট্ হওয়া এবং খিটখিটে মেজাজ প্রভৃতি উপসর্গ মাতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হ'তে দেখা গেছে।

সভ্যদেশে ওরা বিবাহ, প্রেম ও সন্তানাদি বিষয়ে খুব খোলাখুলিভাবে বলতে ও শুনতে লজ্জা বোধ করে না।

অনেক মেয়ে ও ছেলে ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে বসে 'মশাই বিয়ের কতদিন পরে আমাদের সন্তান হ'লে ভাল হয় বলতে পারেন ? বা ক'টি ছেলে ক'টি মেয়ে বা মোট ক'টি সন্তান হ'লে বেশ সুখে দিন কাটান যায় ? কিম্বা আরও প্রশ্ন যেমন কতদিন অন্তর ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়া উচিত ? বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে হাজার রকমের প্রশ্ন !

আমাদের দেশের বিবাহ ব্যবস্থায় আমরা এতগুলো সমস্যার কথা হয়ত মনে মনে ভাবতে পারি, ভাবি না যে তা নয় কিন্তু কার্য্যকালে প্রায় কোনটাই আমাদের ইচ্ছামত ঘটে না সুতরাং দৈবের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমরা বসে থাকি মাত্র।

সমস্ত প্রশ্নগুলিরই অনেক দিক আছে। কয়টি ছেলেমেয়ে হ'লে একটি দম্পতি সুখী হ'তে পারে এবং শুধু তাই নয় ছেলেমেয়েগুলির স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ জীবন ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে ? চোখের সাম্নেই দেখা যায় দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি দম্পতি যেন অভিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছে, আবার বহুপ্রসবিনী ও তার স্বামী সকলকে নিয়ে সুখেই আছে। এ বিষয়ে দুটি দরকারী দিক হচ্ছে আর্থিক সামর্থ্য আর স্ত্রীর স্বাস্থ্য। কোন বিশেষজ্ঞ বলেন মধ্যবিত্তজীবির তিনটি সন্তানই যথেষ্ট।

'পুত্র কন্যার ভীষণ বন্যা' অনেক সংসারে যে অভিশাপের মত দুর্দ্দশা এনেছে এর আর প্রমাণের দরকার হবে না। শুধু তাই নয় সন্তানগুলি পরিপুষ্ট হতে পারেনা এবং মানুষ হ'য়ে বাঁচবার অধিকার পায়না। আমার জানা একটি পরিবার—স্বামী-স্ত্রী—সহরে বাসা বাড়ী অবস্থা নিম্ন মধ্যবিত্ত বলতে হবে—স্ত্রীর বয়স পঁচিশ বছর। ইতিমধ্যেই তিনি এগারোটি সন্তানের জননী। তিনটি প্রসবের সময় বড় ডাক্তারের সাহায্য লাগে এবং অতিকষ্টে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো হয় কিন্তু শেষ বারে আর তাও সম্ভব হয় না—রক্তাল্পতা প্রভৃতিতে ক্ষীণ হ'য়ে প্রসবের পর শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হয় তাকে। এটি চরম দৃষ্টান্ত সত্য কিন্তু খোঁজ করলে বাঙ্গালী পরিবারের ইতিহাসে এর সামান্য ইতর বিশেষই মিলবে বেশী।

বিধাতার ওপর যাদের সব কাজের ভার দেওয়া আছে তারা আর করবে কি—'মা ফলেষু কদাচন' অবস্থা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু স্বাধীন মানুষরা বিবাহিত জীবন থেকে বিধাতা বা ষষ্ঠীদেবীর বোঝাকে বেমালুম সরিয়ে দিয়েছে।

'পুত্রর্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' যে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, সেই শাস্ত্রে সংযমেরও

অনুশাসন আছে—এ যুগের মহাত্মা গান্ধী পুরাতনের শাস্ত্রবাণীর প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন জন্মনিয়ন্ত্রণে সংযমের অস্ত্রই ব্যবহার্য্য! পৃথিবীর এক শ্রেণীর-মনীষিরা এ বিষয়ে একমত· সন্দেহ নেই। কিন্তু সংযমের চাষ যে মাটিতে সম্ভব নয় সেখানে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হ'তে ক্ষতি কি?

জীব জগতে এই প্রজনন এবং বংশরক্ষা এক অদ্ভুত ব্যাপার। বৈজ্ঞানিকের হিসাব থেকে জানা যায় যে, একটি শ্যালমন মাছ তার প্রসবের মরশুমে প্রায় কুড়ি হাজার ডিম প্রসব করে।

আরও শুনুন, একটি সুস্থ-শরীর ভাল রাণী মৌমাছি প্রত্যেক দিন দুই থেকে তিন হাজার ডিম প্রসব করে এবং পুরো মরশুমে কম বেশী এক লক্ষ ডিম প্রসব করে! এই রকম কত জীব আছে তার ইয়ত্তা নেই।

মানুষের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম কি?

একটি সুস্থ মানুষের কতগুলি সন্তান হতে পারে আপনি কল্পনা করুন। বিজ্ঞানের অনুমান হচ্ছে যে, সমস্ত ছেলেপুলেগুলি তার যদি 'বহাল তবিয়তে' বাঁচবার সুযোগ পায় তা'হলে এই গোটা পৃথিবীতে আর কারও স্থান হবে না। সবটাই তারা দখল করতে পারবে এবং শুধু এখন নয় সেই সুদূর অতীত থেকে যত মানুষ পৃথিবীতে বাস করেছে তাদের সংখ্যাও এর মধ্যে পড়বে। শুধু এতেই স্থান সঙ্কুলান হবে না একে একে সমস্ত সৌর-জগতের সব ক'টি গ্রহকেও লাগবে এই সন্তানগুলির বাস করার জায়গা দিতে।

মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের এক শ' তনয়কাহিনী শুনে বিস্মিত হওয়া আমাদের ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে। সুখের বিষয় সবগুলি সন্তানকে বাঁচাবার সুযোগ কারুরই হয় না। তা না হলে কোন একটি মাছ বা সাপের সন্তানাদিতে পৃথিবী এমন কিলবিল করতো যে, আমাদের এক পায়ে দাঁড়াবার স্থানটুকু থাকতো কি না সন্দেহ!

যাই হোক প্রাকৃতিক নিয়মেই জন্ম ও নিয়ন্ত্রণ উভয় কাজই চলছে একই সঙ্গে।

যাদের বিয়ে হ'ল

মানুষ অনেক জায়গাতেই যেমন প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করেছে এখানেও তাই। লোক সংখ্যা যখন বাড়াবার দরকার হয়েছে তখন রাষ্ট্র বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থায় তা বাড়িয়েছে। আবার কম করার অর্থাৎ জন্মনিরোধের অনেক রকম ব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

* * * *

সমাজ রাষ্ট্র ছেড়ে ব্যক্তির জীবনে ফিরে আসা যাক্। সন্তান জন্ম বিবাহিত জীবনে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়।

আমার অতি পরিচিত এক পরিবারের কথা বলি। আধুনিক রুচিসম্পন্ন অবনীশ যখন বাপের সুপুত্রের মত বিবাহে মত দিলে, বাড়ীতে আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেল। ছেলেরা অনেক সময়ে বাপ মার অবাধ্য হয় কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে অবাধ্য ছেলেকেই দেখা যায় অকস্মাৎ সম্মতি জানিয়ে বাধ্য হয়ে পড়তে। কেননা যখনই আপনার কোন সদ্য বিবাহ-প্রস্তাবিত বন্ধুকে সম্বর্দ্ধনা করবেন—গুড লাক্—থ্রি চিয়ার্স ফর ইওর ম্যারেজ ইত্যাদি ব'লে—সে উত্তরে শুধু বিনীতভাবেই বলবে—কি করবো ভাই, বাবা মা'রা একান্ত ধ'রে বসলেন—না বলতে পারলুম না...ইত্যাদি। যাক, অবনীশের কথা হচ্ছিল—অবনীশও এইভাবে বিবাহ করলো—পিতার অজ্ঞাতেই বলতে হবে, পিতার পছন্দ-করা একটি পাত্রীকে। বাপ আর ছেলের পছন্দ এক নাও হ'তে পারে (বয়সের পার্থক্য ত আছে) এক্ষেত্রেও তাই হোল। অবনীশ স্ত্রীকে দেখলো বটে তার স্ত্রী হ'তে কিন্তু ভালচোখে তাকে দেখতে পারল না। এই বিসদৃশ লাগা তার আর গেল না। বাপ বললেন—ও দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে। মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এইভাবে দুটি বছর গেল। অবনীশ এখন প্রাউড্ ফাদার—একটি কন্যার পিতা। অবনীশের মাকে আমি মাসীমা বলি। একদিন মাসীমার কাছে শুনলাম অবনীশ স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় গেছে—শুনে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে আছি; মাসীমা বললেন—ওরে আজকাল ওদের মধ্যে যে বেশ ভাব হয়েছে, খুকীকে পয়মন্ত বলতে হবে, কি বল?

সন্তানের আগমনে অনেক কীটদষ্ট সংসারে শান্তির শ্রী ফুটেছে। স্বামী

স্ত্রীর মধ্যে যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান ছিল সন্তান অনেকক্ষেত্রেই সেথা সেতু, বন্ধন করেছে। প্রৌঢ়ারা আজও তাই বলে সোয়ামী স্ত্রীর খিটিমিটি ছেলেপুলে হ'লে শুধরে যাবে।



সেতুবন্ধন

সন্তানলাভ মেয়েদের কাছে যেমন আনন্দের তেমনি গর্ব্বের বিষয় সন্দেহ নেই। রূপকথার মত প্রাচীন চলিত অনেক গল্পে শোনা যায় সাধু সন্ন্যাসীরা বন্ধ্যানারীর হাতে ভিক্ষা বা খাদ্য গ্রহণ করে না। সন্তানলাভ মেয়েদের কাছে নারীজীবনের সাফল্য এনে দেয়! বিশেষ আমাদের দেশের আদর্শ যা ছিল তাতে নারীজীবনের তিনটি বড় অবলম্বন হচ্ছে স্বামী, সন্তান ও সংসার।

সভ্যতার হাওয়ায় এই আদর্শ কিছু সরে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়। কেননা এখন শোনা যায় আধুনিকা কারু কারুর কাছে, সন্তান তারা যতদিন না পায় ততদিনই ভাল। সন্তান ধারণের দশটী মাস যে কষ্ট ও ত্যাগ-স্বীকার, তারা নাকি তা সইতে প্রস্তুত নয়। দেহশ্রী নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার আশঙ্কাও আছে এর পিছনে। পাশ্চাত্যদেশে তাই গর্ভধারণকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা পর্য্যন্ত হয়েছে—অনেকখানি সাফল্যও এসেছে নাকি। 'টেষ্ট-টিউব বেবীর' কথা অনেকেই জানেন।

মেয়েদের কাছে একটা প্রশ্ন, দেহ ও সন্তান—কোনটা তাদের বেশী কাম্য।

যৌনন অটুট থাকবে—দেহ থেকে এক টুকরো সৌন্দর্য্যও খসবে না অথচ সন্তানের মা হব, এরকম কামনা কার আর না হয়? কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়ে সন্তান লাভের বিনিময়ে দেহ, আরাম এমন কি দেহশ্রীকেও উৎসর্গ করেছে। মাতৃত্বের মহত্ব ও আকর্ষণ এতই বড়। কিম্বা অজ্ঞাতসারেই মাতৃত্বের দিকে এগিয়ে গেছে তারা।

অনেক 'আর্টিষ্ট' মেয়ে, যেমন নাচিয়ে গাইয়ে কিম্বা অভিনেত্রী—যাদের দেহ-সম্পদ অটুট রাখা একান্ত দরকার—কোন কিছুর বিনিময়েও তারা তা ছাড়তে পারে না—তাদের মধ্যে অনেককে দেখা গেছে পরিণামে মাতৃত্বকে আঁকড়ে ধরতে এবং শেষে ইসাডোরা ডানক্যানের মত সন্তান লাভের অভিজ্ঞতাকে উচ্ছ্বসিতভাবে মনোরম ক'রে লিখতে। মা সমস্ত শরীর মন দিয়ে অনুভব করে সদ্যজাত এক ডেলা নরম মাংসের মত যে একটি জীব তার কোলে এসে হাজির—যে তার শরীরকে ভেঙ্গে চুরে বাঁকিয়ে দিল—দশটি মাস অস্পষ্ট আশঙ্কা ও যাতনায় কাটাতে বাধ্য করলো যে, সেই জীবটিই তার কোলে—কিন্তু এই ত, তার মধ্যে দুষ্টুমির কোন লক্ষণ ত নেই? তাকে দেখেই যেন তৃপ্তি—বুক ভরে যায়। ছোট্ট হাত দুটো নাড়িয়ে সে কেমন খেলা করে—ছোট্ট মুখটা দিয়ে দুগ্ধভার-নম্র স্তনাগ্রচূড়াটি কামড়ায় আর একটা হাত দিয়ে অন্যটিকেও অধিকার ক'রে রাখে—কই তখন মায়ের রাগ দুঃখ কষ্টের কোন কথাই ত মনে থাকে না? পৃথিবীর সব সুখ এই ক্ষুদ্র জীবটির স্পর্শের কাছে যেন তুচ্ছ হয়ে যায়।

যারা মনে করে সন্তান হলেই গর্ভধারিণীর দৈহিক গঠন ও স্বাস্থ্য স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায় তারা ভুল করে। কেন না এর বিপক্ষে হাজারটা প্রমাণ দেখানো যেতে পারে। ইউরোপীয়া মহিলাদের অনেককে দেখা যায় চার পাঁচটি সন্তানের মা হয়েও দেহশ্রীতে এমন যৌবন জড়িয়ে রেখেছে যে, তাকে দেখলে কুমারী বলেই মনে হবে। সাঁওতাল জাতীয় অসভ্যদের মধ্যেও এই রকম অটুট শরীর প্রায়ই দেখা যায়। অবশ্য এরা সাইক্লিং বা রাইডিং করে না কিন্তু শারীরিক অন্য পরিশ্রম করে।

চেহারা সব চেয়ে খারাপ হয় আমাদের সংস্কারবদ্ধ দুর্ব্বল-দেহ মধ্যবিত্ত বাঙালীদের মধ্যে। এক একটি জননীকে এমন দেখেছি যে, সে প্রথম সন্তান লাভের পর দেহশ্রীর পাত্রটুকু নিঃশেষে উজাড় ক'রে স্বাস্থ্য-হীনতার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। কথা আছে একটা 'কুড়িতে বুড়ী'। কুড়িতে কেন আঠারোতেই দেখেছি বুড়ীত্বের জড়োয়া জড়িয়ে অনেক


আঠারোতেই বুড়ীত্বের জড়োয়া পরা

মেয়ে আমাদের ঘরেই বিচরণ করে। প্রবীণারা এদিকে চোখ দেবার ফুরসুৎ পায় না—এটা যেন স্বাভাবিক স্তরেরই ঘটনা বিশেষ। আঁতুড়ের ছোঁওয়া নাওয়া স্পৃশ্য অস্পৃশ্যতার বিচার নিয়েই তারা ব্যস্ত।

আজকাল ডাক্তাররা বলেন—গোড়া থেকে নিয়ম মত চলতে পারলে সন্তান প্রসবের পরও প্রসূতির দেহশ্রীকে অটুট রাখা যায়। প্রসবান্তে যে ক্ষয় হয় তাকে পূরণ করা এবং অধিক আহার থেকে সাবধান থাকা (যাতে চর্ব্বি জমতে না পারে) দুটাই দরকার। নিয়মিত বিশ্রাম আর নিয়মিত সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ব্যায়াম এগুলি দিয়েই নাকি দেহের গঠন অটুট রাখা যায়—সঙ্গে কিছু কিছু বক্ষ-পরিচর্য্যাও দরকার।

স্ত্রীর দেহশ্রী পতনের আশঙ্কায় স্বামীও অনেক সময় পুত্র সম্ভাবনাকে ভাল চোখে দেখতে পারে না। শুধু তাই নয় সন্তান জন্মের আগে কয়েকমাস এবং পরের কয়েকমাস স্ত্রীর শরীরের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তা মোটেই প্রীতিকর নয় (অবশ্য সকলেরই এতখানি নয়)। এতখানি সময় যৌনসংযম বাধ্য হয়েই করতে হয় তাকে যার ফলে অসহিষ্ণু হ'য়ে গর্ভজাত সন্তানকে সময়ে সময়ে বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখতেও সে ইতস্ততঃ করে না। আবার প্রিয়তমার অত্যন্ত কষ্টে সে নিজে ব্যথিত হয় এবং সে যে স্ত্রীর এই কষ্টের কারণ এটা অনুভব ক'রে নিজেই লজ্জিত হয়। মাঝে মাঝে তার মনে হয় স্ত্রীর কষ্টের অর্দ্ধেক বিধাতা তাকে দিল না কেন? এমন অভিযোগও সে বিধাতার কাছে পেশ ক'রে বসে।


কষ্টের অর্দ্ধেক সে যদি পেত

স্ত্রী অনেক সময় গর্ভাবস্থায় স্বামীকে স্বার্থপর

ভাবে এবং অনেক অভিযোগ স্বামীর ওপর দিয়ে ফেলে। বুদ্ধিমতি স্ত্রী স্বামীর সত্যিকার মনোভাব বুঝতে পারে স্বামী যে তার জন্য দুঃখিত এটা বুঝতে দেরী লাগে না তার এবং তাকে ভুলিয়ে রাখবার অনেক কৌশল অবলম্বন করতে পারে।

একটা উপন্যাসে পড়েছিলাম কোন শিল্পী স্বামীর প্রিয়তমা স্ত্রী যখন নিজেকে গর্ভবতী বুঝতে পারলো তখনই সে স্বামীর কাছে এটি গোপন রেখে কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে স্বামীর কাছে এক বৎসরের ছুটি চাইলো। যেন সে কোন আত্মীয়ার কাছে দূরদেশে গিয়ে থাকতে চায়—স্বামীকে স্বীকার করিয়ে নিল যে, এই বারোমাসের মধ্যে সে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না এবং কিছুতেই তা হবে না। চিঠিপত্র চলবে মাঝে মাঝে।

এক বৎসর পূর্ণ হ'তে স্বামী অধীর আগ্রহে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। (অবশ্য স্ত্রী চিঠিতেই তা মঞ্জুর করেছিল) পর্দ্দার অন্তরাল থেকে স্ত্রী এল—স্বামী দেখলো সেই কুসুমপেলব তন্বী ঢল-ঢল-যৌবন দেহলতা, মুখে মধুর হাসি—অসীম আগ্রহে সে লতাটিকে বুকে তুলে নিল—অজস্র চুমায় মুখখানি ছেয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এর অর্থ কি ভায়োলা? তোমার সঙ্গহারা হ'য়ে এই যে একটা যুগ আমার ওপর দিয়ে গেল তার পায়ের তলায় আমার কতগুলো পাঁজর চূর্ণ হয়েছে জানো?

ভায়োলা কণ্ঠে মধু মিশিয়ে বললো—জানি গো জানি? সে দৈত্য আমাকেও কি কম ব্যথা দিয়েছে! কিন্তু ভাঙ্গা পাঁজর জোড়বার অমৃত যে আর একজন এনেছে আমাদের কাছে—আমায় মাপ করো বন্ধু। আমাদের কাছে নতুন এক অতিথি এসেছে—

পরিচারিকাকে ডাক দিল সে। পাশের ঘর থেকে ফুটফুটে একটি দু'মাসের শিশুকে নিয়ে পরিচারিকা হাজির হল।

স্বামীর কাছে এক নিমেষে সমস্ত রহস্য জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল—কোলে তুলে নিল তার সন্তানকে শিশির ধোওয়া যেন একটি ফুল।

স্ত্রী বুঝেছিল স্বামীর শিল্পি-মনে তার চেহারার অসঙ্গতি প্রতিনিয়ত যে আঘাত করবে—সে হয়ত সহ্য করবে তা নীরবে, হয়ত জোর করেই

সে রুখে রাখবে তার প্রতিবাদ প্রবৃত্তিকে কিন্তু স্বামীর ওপর এতবড় অত্যাচার সে করবে কেমন ক'রে?

সন্তানলাভে মায়ের দেহের পরিবর্ত্তন যেমন স্পষ্ট হয় তার মানসিক কাঠামোও অনেকখানি বদলে যায়। তার মনের কোমল বেদীতে আর একটি আগন্তুকের স্থান ক'রে দিতে হয় ত।

স্বামীদের এই উপলক্ষে গোপন মনে সময়ে সময়ে একটু ঈর্ষা জাগে না যে তা নয়। সভ্য মানুষ আমরা এই ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করতে লজ্জা আসে কিন্তু ছোটখাটো অনেক খুঁটিনাটিতে স্বামীদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে এর জন্যে। মনে করুন সপ্তাহান্তে শহর থেকে দূরে পল্লীতে স্বামী বাড়ী ফিরলো, মনে মনে ফর্দ্দ ক'রে কত কি জিনিষ সে নিয়ে গেছে স্ত্রীকে বেশ একটু তাক লাগিয়ে দেবে। স্ত্রীর সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে রক্তিমোজ্জল মুখখানি সে দেখতে চায়—সাত দিনের বিরহ সে কাটিয়েছে যে স্বপ্ন দেখে। স্ত্রীর কাছে বোঝা নামিয়ে সে প্রতীক্ষা করে স্ত্রী কখন খুলবে সেটি—খুলেই হয়ত চেখদুটি বড় বড় ক'রে স্বামীর দিকে তাকাবে, আর একটু বেশী শ্রদ্ধা ও দরদে বিগলিত হবে—কিন্তু হায় খোকাই বাদ'সাধলে—এমন তার জেদ আর এমনই তার বায়না তখন পেয়ে বসলো যে, মায়ের কাছ থেকে কিছুতেই তাকে বিচ্ছিন্ন করাই গেল না—এবং এমনই লণ্ডভণ্ড করে দিল সব যে, মনের সুর গেল কেটে—স্বামীরও সামান্য কারণে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো এমন যে, সে রাগে পায়ে ক'রে শুট্ মারলে পোটুলাটাতে, আর গুঁড়িয়ে গেল ঠুন্‌কো জিনিষগুলো। ক্ষোভে খাটে শুয়ে পড়লো সে আর মনে মনে খুঁজতে লাগলো বাড়ী আসার সময় প্রথম কার মুখ দেখে সে বেরিয়েছিল।

আবার এমন বাপ বিরল নয় খোকার জন্যই যার ভাবনা বেশী—সেই ছোট কচি মুখখানি সে বাড়ীর বাইরে সব সময়ই ভাবতে থাকে—তাকে কি পরালে মানাবে বেশী, কি হাতে দিলে একটিবার হেসে উঠবে, কচি কচি কথার তালিকায় কয়টি নতুন কথা বেড়েছে……খোকার পরেই মনে পড়ে স্ত্রীকে কিম্বা মনে পড়ে খোকা-জড়িতা স্ত্রীকে।

খোকা ও খুকীর মধ্যে বেশী আদর কে পায় বলুন দেখি? বাড়ীর

পরিধির মধ্যে খোকারই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—কন্যাদায়ের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা হয়ত খুকীদের আদরের অনেকখানি কেড়ে নেয়। যাই হোক বাপেরা কিন্তু খুকীদের উপর একটু বেশী অনুরাগপ্রবণ হলেও মায়েরা ততটা হয় বলে মনে হয় না বরং খোকাদের ওপরই তাদের যেন টানটা বেশী। মেয়েরা বড় হ'লে বাপের দুর্ভাবনা বাড়লেও মায়ের দুর্ভাবনা বেশী বাড়ে ব'লেই মনে হয়—স্বামীকে বার বায় সে মেয়ের ক্রমবর্দ্ধমান বয়স ও বিবাহোচিত বয়ঃপ্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করে। মেয়েরা আধুনিকা ব'লে মায়েদের স্বস্তি কমে যায় অন্ততঃ তাদের আধুনিকাদের পর্য্যায়ে তারা ফেলবেই। মায়েদের ঝোঁক যেন প্রাচীনের জয়ধ্বজা তুলে ধরার দিকে। বাপ মেয়েকে করে বেশী বিশ্বাস হয়ত নিজে পুরুষ বলেই। প্রমাণ শুনুন—

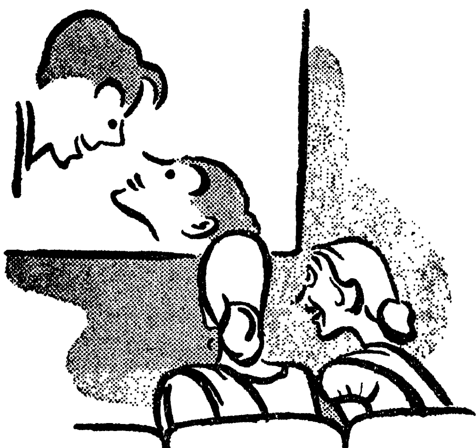
স্ত্রী স্বামীকে বললো দেখ, মিলির ত উনিশ বছর বয়স হলো, আমি তাই আজ ওর সঙ্গে কথা বলছিলুম—দুদিন পরে ত বিয়ে হবে, সংসার সম্বন্ধে কি বোঝে তাই দেখছিলুম।

স্বামী গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় 'সেত ভাল কথা, কিছু শিখলে নাকি ?

সন্তান স্বামীস্ত্রীর প্রেমজীবনে একটা বৈচিত্র্যপ্রদ টনিক বিশেষ। নিঃসন্তান পরিবার দেখলেই বুঝতে পারবেন—হয় খিটখিটে মেজাজ, নয় একটা বিশ্রী গুমোট আবহাওয়া বাড়ীটা ঘিরে থাকে। যৌবনের রোমাঞ্চকর প্রেম দাম্পত্য জীবনের প্রথম অধ্যায়েই ত শেষ হয়ে যায়, থাকে শুধু সঙ্গসুখের অভ্যাস। এই অভ্যাসকে মূলধন ক'রে কেই বা চাইবে সারাজীবনের সংসার চালাতে ? তাই সম্বন্ধ মলিন হয়ে পড়ে। বন্ধ্যা নারীদের অতৃপ্তি নানাদিক দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সমাজ বা দেশসংস্কার ব্রত নিয়ে হয়ত তারা জীবন কাটাতে চায়—পুরুষের মতই তাদের নিঃসঙ্গ জীবন—কর্ম্ম দিয়ে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা মাত্র। আবার হয়তো দেখবেন একটি পোষাপাখী, কুকুর বা বিড়ালের ওপর তাদের অপত্যস্নেহের প্রস্রবণ ঝ'রে পড়ে।

সময়ে সময়ে সিনেমা-প্রেমের দিকে তারা অপলক-চক্ষু হ'য়ে

থাকে জীবনের ফাঁক ভরাবার জন্তই। স্বামীর ওপর মন ওঠে বিমুখ হয়ে আবার সময়ে সময়ে পুত্রহীনার নিঃসঙ্গচিত্ত তাকেই সর্ব্বস্ব ব'লে আঁকড়ে ধরতে চায় জোর ক'রে। হয়ত পাশের বাড়ীর শিশুর কল-কাকলির অস্পষ্টধ্বনি উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে তুজনে।



রূপালি পর্দ্দার প্রেমকাহিনী

সন্তানজন্মের পর স্বামীস্ত্রীর কর্ত্তব্য যায় বেড়ে—জীবনে তাদের গুরুত্ব আসে। ছেলেকে মানুষ করার দিকে তাদের সব চেষ্টা ও যত্ন চলে যায়। ভবিষ্যতে তারাই ত হবে অবলম্বন। প্রথম থেকেই স্বামীস্ত্রীর জানা উচিত শিশু পালনের সব কিছু। এ বিষয়ে শেখার আগ্রহ যেন তাদের থাকে। তাচ্ছিল্য আর অবহেলা অজ্ঞতার মতই অপরাধ বলতে হবে।

ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে, তাদের মানুষ করা নিয়ে কল্পনায় কত স্বপ্নচ্ছবি স্বামী-স্ত্রীর মনে রঙীন হ'য়ে উঠতে থাকে। তাই নিয়ে ওদের কল্পনার আর অন্ত থাকে না।

নবদম্পতির প্রথমজীবনে সন্তান লাভ হ'লে একদিকে তাদের যেমন শত অসুবিধার সৃষ্টি হ'তে থাকে, না-জানা অনেক দায়িত্বের ভার নিয়ে পায়ে বেধে প'ড়ে যাবার মত, অন্যদিকে আবার পুতুলখেলার মত সন্তান নিয়ে খেলায় যেন তারা মেতে ওঠে।

নারীমহলে পুত্রবতীর গরব বেশ একটু বেশী......বহু সন্তান-প্রসবিনীও অনেক সময় বহুসন্তানের মাতৃত্বের গর্ব্ববোধ করেন। ছাড়া-হাত-পা কথাটা মেয়েমহলে চলে খুব। অপুত্রিকা বা অল্পসন্তানের জননী

নিজেকে 'ঝাড়া হাত-পা' বলে সান্ত্বনা দেন—অবলীলাক্রমে তাঁর ইতস্ততঃ বিচরণ করেন। সিনেমা থিয়েটার নিমন্ত্রণ-পার্টি সামাজিং উৎসব সব জায়গায় আধুনিক ষ্টাইলে দেহবল্লরী সাজিয়ে হাইহিলে ভ দিয়ে তাঁরা নিজেদের দর্শনীয় ক'রে ঘুরে বেড়ান—মুখে অনর্গল কথা ভোজবাজি চলতে থাকে। ছেলেপুলের জড়িমা তাঁদের যে নিতান্তই জড়িয়ে রাখতে পারেনি এটুকু তাঁরা প্রকাশ করতে ভোলেন না।

কিন্তু এই তথাকথিত স্বাধীনতা আর শান্তি এক জিনিষ নয়। তাই দেখি এই শ্রেণীর দম্পতির বাড়ীতে স্বামীস্ত্রীর কাজের তালিকা কত ছোট—কত সহজেই তাদের অল্প কাজ ফুরিয়ে যায়—প্রচুর অবকাশ অত্যাচার হয়ে ঘাড়ে চড়াও হয়। মেজাজ স্বভাবতই উগ্র হয়ে থাকে—শেষে পরস্পরের মাঝে—একে অপরের ওপর অতিষ্ঠ হওয়াও বিচিত্র নয়। আবার এই ছবির পাশে বিবাহের জম্‌জমাট রূপও একটা কল্পনা করুন। বারো চোদ্দোটী ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখ শান্তির মাঝে সারাজীবন কাটিয়ে জীবনের সায়াহ্নেও কেমন হাসিখুসি মুখে পায়চারি করেন আর যিনি নাতিনাতনীর সঙ্গে ঘোড়া ঘোড়া খেলতে লেগে যান। কাদা মাখা ঘর্ম্মাক্ত দেহ, ধুলি-ধুসর সজ্জা এই বৃদ্ধকে কিম্বা বৃদ্ধাকে দেখে মনে হয় না কি যে, জীবন তাঁদের কিছুই ফাঁকি দিতে পারেনি ?



বিয়েকে এরাই জম্‌জমাট করেছে